সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা

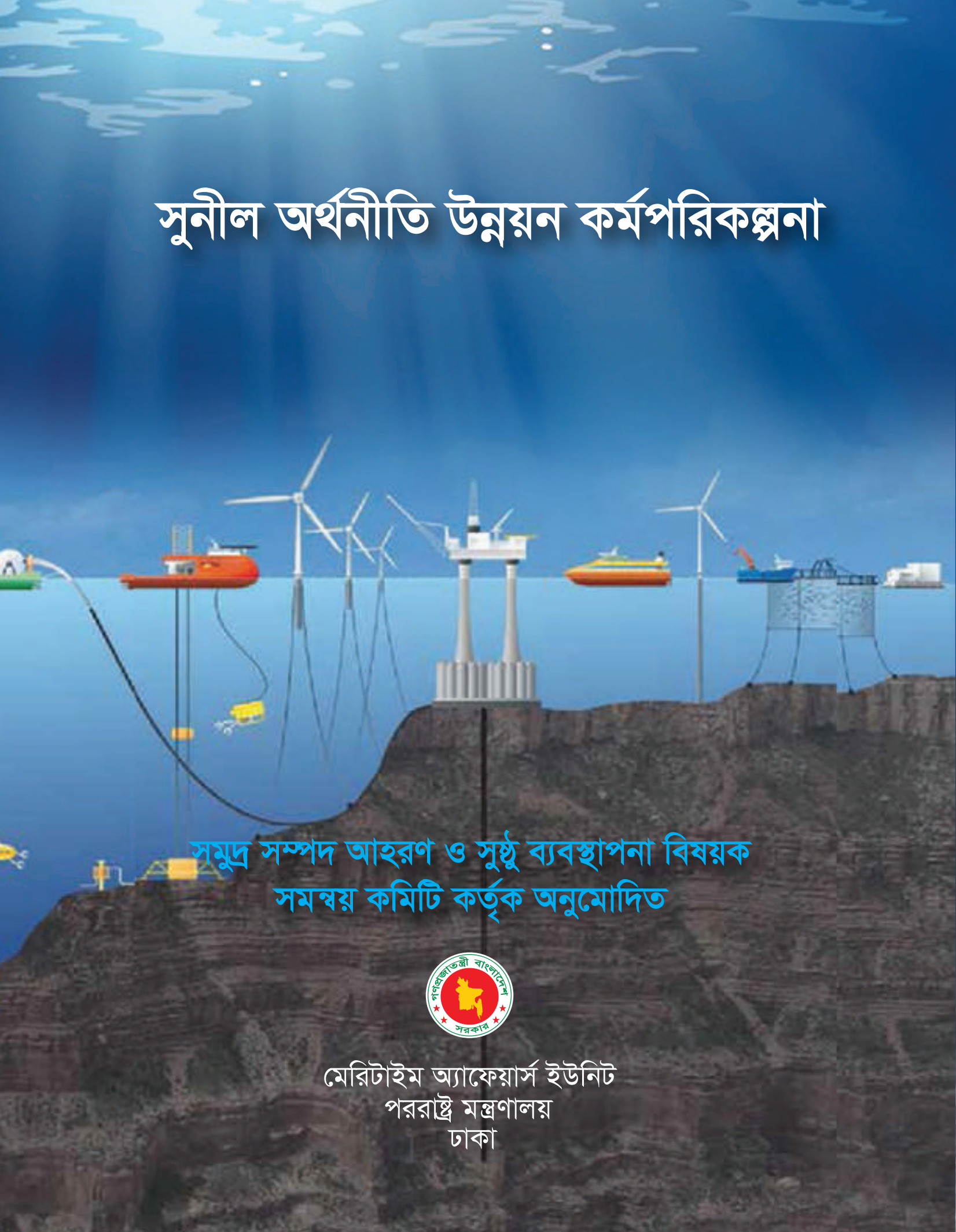

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত

মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ঢাকা

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত

সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা

মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নং

সূচনা..... ৪

১. সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনা..... ৫
১.১ প্রেক্ষাপট..... ৫
১.২ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries Management) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা..... ৭

২. সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়ন..... ১২
২.১ প্রেক্ষাপট..... ১২
২.২ মেরিকালচার (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা..... ১৪

৩. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping) এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন..... ১৯
৩.১ প্রেক্ষাপট..... ১৯
৩.২ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping)-এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা..... ২০

৪. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Marine Tourism)-এর বিকাশ সাধন..... ২৪
৪.১ প্রেক্ষাপট..... ২৪
৪.২ সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Marine Tourism)-এর বিকাশ সাধনের জন্য কর্মপরিকল্পনা..... ২৫

৫. অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy and Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়ন ২৭
৫.১ প্রেক্ষাপট..... ২৭
৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy and Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা..... ৩২

৬. স্থিতিশীল জীবিকার জন্য ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগত সেবাসমূহ (Ecosystem Services of Mangroves) নিশ্চিতকরণ ৩৯
৬.১ প্রেক্ষাপট..... ৩৯
৬.২ ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগত সেবা নিশ্চিতকরণের (Ecosystem Services of Mangroves) জন্য কর্মপরিকল্পনা... ৪০

৭. জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প (Ship Building and Recycling Industry) সম্প্রসারণ..... ৪২
৭.১ প্রেক্ষাপট..... ৪২
৭.২ জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প (Ship Building and Recycling Industry) সম্প্রসারণের জন্য কর্মপরিকল্পনা ৪৩

৮. সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ..... ৪৪
৮.১ প্রেক্ষাপট..... ৪৪
৮.২ সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মপরিকল্পনা ৪৫

৯. মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning) বাস্তবায়ন..... ৪৭
৯.১ প্রেক্ষাপট..... ৪৭
৯.২ মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning) বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা..... ৪৮

সূচনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির ফলশ্রুতিতে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ তার মূল ভূখন্ডের ৮১ শতাংশ পরিমাণ রাষ্ট্রীয় জলসীমা অর্জন করে অর্থাৎ সমুদ্রে মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলরাশির জলস্তম্ভ, সমুদ্রতল এবং অন্তমৃত্তিকায় বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অর্জন দেশের মেরিন ও উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সামুদ্রিক মৎস্য চাষ, পর্যটন, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বাণিজ্য (নৌপরিবহন) ও জ্বালানিকে (গ্যাস, তেল ইত্যাদি) ঘিরে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে যা সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) ধারণার অন্তর্ভুক্ত। সুনীল অর্থনীতি বলতে বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রেখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাণিজ্য ও শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমুদ্রের অনুন্মোচিত (untapped) সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার ধারণাকে বুঝায়। এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে 'সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি' শীর্ষক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে এবং অংশীজনের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) ধারণার বিকাশ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারবাহিকতায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নকে বেগবান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, বাণিজ্যিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ পূর্বক সুনির্দিষ্ট ০৯ টি খাত চিহ্নিত করে সে সব খাতের বিকাশ ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে যা বাংলাদেশ সরকারের উপরিল্লিখিত কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। যে ০৯টি খাতের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে সেগুলো হলঃ

১. সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনা;
২. সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়ন;
৩. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping)-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
৪. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Marine Tourism)-এর বিকাশ সাধন;
৫. অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy and Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়ন;
৬. স্থিতিশীল জীবিকার জন্য ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগত সেবাসমূহ (Ecosystem Services of Mangroves) নিশ্চিতকরণ;
৭. জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প (Ship Building and Recycling Industry) সম্প্রসারণ;
৮. সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
৯. মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning) বাস্তবায়ন।

উল্লেখ্য, বিগত সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে 'EU-Bangladesh Joint Collaboration on Blue Economy' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিরূপণে মাঠ পর্যায়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সহ সকল অংশীজনের (Stakeholders) মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা বিশ্লেষণপূর্বক সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মতামত এবং সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে নীতিনির্ধারক, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবী এবং সুশীল সমাজের সাথে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে করণীয় দিকগুলো নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়। উল্লিখিত সমীক্ষা/স্টাডি হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত উপরোক্ত ০৯ টি খাতের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ঃ

লক্ষ্য-১: সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে 'ভিশন-২০৪১' অর্জন;

লক্ষ্য-২: সামুদ্রিক মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণিজ সম্পদ চাষ ও আহরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ;

লক্ষ্য-৩: বন্দর ব্যবস্থাপনা, জাহাজ শিল্পের উন্নয়ন ও মৎস্য সহ অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ;

লক্ষ্য-৪: জীবাশ্ম ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;

লক্ষ্য-৫: মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং, সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাব মোকাবেলা ও সমুদ্রে সুশাসন নিশ্চিতকরণ;
লক্ষ্য-৬: সুনীল বায়োটেকনোলজি নির্ভর শিল্পায়নের প্রবর্ধন, উদ্ভাবনার প্রসারণ, কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টি এবং পর্যটন সেবার উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

সুনীল অর্থনীতির পুরোপুরি সুফল পেতে এ সকল কর্মপরিকল্পনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের উদ্যোগ নিতে হবে।

১. সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনা

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মৎস্য আহরণ ও চাষের অগ্রগতির তুলনায় সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন অপ্রতুল কেননা অধিকাংশ সামুদ্রিক মৎস্য অগভীর সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় আহরণ করা হয়ে থাকে। জাহাজের সক্ষমতা ও যথাযথ ফিশিং প্রযুক্তির অভাবে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা করা হয় না। বর্তমানে আমাদের মৎস্য আহরণ উপকূল থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরত্বে সীমাবদ্ধ। সুনীল অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশের মোট জাতীয় মৎস্য উৎপাদনে (৪.৩৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন) সামুদ্রিক মৎস্য খাতের অবদান ছিল মাত্র ১৫% (০.৬৫৯ মে. টন) যাতে ২৫৫টি বাণিজ্যিক ট্রলার এবং ৬৭,৬৬৯টি আর্টিসানাল নৌযান (যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান) মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয়। মোট ০.৬৫৯ মিলিয়ন মে. টন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ৮৩.৭৫% আসে আর্টিসানাল স্মল স্কেল ফিশারি (artisanal small scale fishery) তথা যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান থেকে; যাতে ১০-৪০ মিটার পানির গভীরে গিল নেট (gill nets), সেট ব্যাগ নেট (set bag net), সাইন নেট (seine net), হুক ও লাইন (hook and line), ট্র্যামেল নেট (trammel net) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট ১৬.২৫% আসে লার্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিশারি (industrial fishery) তথা বাণিজ্যিক ট্রলার থেকে।

৪০-১০০ মিটার পানির গভীরে বেশীর ভাগ বাগদা চিংড়ি (penaeid shrimps) এবং ফিন ফিশ (fin fish) আহরণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার (industrial trawler) ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইলিশ মাছ। বর্তমানে বিশ্বের ৫০-৬০% ইলিশ মাছ বাংলাদেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক জলরাশিতে, ২০-২৫% মায়ানমারে, ১৫-২০% ভারতে এবং অবশিষ্ট ৫-১০% অন্যান্য দেশে আহরিত হয়। এখনও পর্যন্ত দেশে মৎস্য আহরণ সনাতন কৌশল ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে পুরনো কৌশল ব্যবহার হতে বের হয়ে আসতে হবে এবং সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের বাইরে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত গভীর একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ গভীর সমুদ্র (high seas) থেকে বিশালাকার পেলাজিক (pelagic) মৎস্য আহরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই নতুন নতুন মৎস্য ক্ষেত্র অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্যের স্টক/মজুদ (stock) নির্ণয়ের জন্য জরিপ সম্পাদন করতে হবে। ২০১৮ সালে নরওয়ের RV Dr. Fridtjof Nansen নামক জাহাজ বঙ্গোপসাগরে একটি মৎস্য জরিপ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রাথমিক গবেষণা কার্য সম্পাদন করেছে। তবে সুনীল অর্থনীতির (Blue Economy) পুরোপুরি সুফল পেতে আরও বেশী পরিমাণে এ ধরণের জরিপ সম্পাদন প্রয়োজন। এছাড়াও, ক্যাপচার ফিশারিজ (capture fisheries) এর মজুদ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশকে লং-লাইন ও হুক-ফিশিংসহ যথাযথ গভীর সমুদ্র ফিশিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং বঙ্গোপসাগর এবং তদসংলগ্ন আন্তর্জাতিক জলরাশি হতে গভীর সমুদ্র প্রজাতির মৎস্য আহরণের জন্য সহায়ক গিয়ার ও জাহাজ ব্যবহার করতে হবে।

সম্পদের স্বল্পতা সত্বেও সম্প্রতি বাংলাদেশে মৎস্য শিল্পের আকার (industrial fleet) বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি ও সমুদ্রতলের মৎস্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মৎস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে চিংড়ি আহরণ কমছে। Bangladesh Marine Fisheries Capacity Building Project (BMFCBP) হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৩০০টিরও অধিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬৭,০০০ কাঠের তৈরি (artisanal) নৌকা মৎস্য আহরণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকল্পটি এ সেক্টরে মৎস্য আহরণ তদারকি করার জন্য একটি স্থলভিত্তিক (land-based) জরিপ কর্মসূচী চালু করেছে এবং ৩২টি নির্দিষ্ট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র (landing station) হতে উপাত্ত সংগ্রহ করছে। BMFCB প্রকল্পের আওতায় ২০১৬ সালে একটি ৩৮ মিটার দৈর্ঘ্যের গবেষণা জাহাজ 'আরভি মীন সন্ধানী (RV Meen Shandhani)' সংগ্রহ করা হয়েছে। Food and Agriculture Organization (FAO) তাদের ''Technical Support for Stock Assesment of Marine Fisheries Resources in Bangladesh'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অগভীর ২০০ মিটার উপকুলীয়

এলাকায় জরিপ সক্ষমতা সম্পন্ন 'আরভি মীন সন্ধানী (RV Meen Shandhani)' জাহাজের জরিপ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ও সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও, এ প্রকল্পটি ফিশারিজ মনিটরিং, স্টক/মজুদ নির্ণয় এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশে টেকসই উপকূলীয় ও মেরিন ফিশারিজ বিষয়ে BMFCB প্রকল্প এবং FAO-এর অর্থায়নে Technical Cooperation Programme (TCP) প্রকল্পটি ২০১৯ সালে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে (বাংলাদেশ-৪১ মিলিয়ন মাঃ ডঃ, বিশ্বব্যাংক-২৪০ মিলিয়ন মাঃ ডঃ) ২০১৯ সাল হতে Sustainable Coastal Marine Fisheries Project (SCMFP) চালু রয়েছে। মৎস্য খাতে সুশাসন, টেকসই ব্যবহার ও সমন্বিত-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণসহ উপকূলীয় সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে মৎস্য মজুদ মূল্যায়ন/নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা পরামর্শের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদানের নিমিত্ত মৎস্য তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 'আরভি মীন সন্ধানী (RV Meen Shandhani)' জাহাজটি চিংড়ি, সমুদ্রতলের মৎস্য সম্পর্কিত জরিপ তথ্যাদি এবং সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্র সামুদ্রিক মৎস্য সম্পর্কিত জরিপ তথ্যাদি প্রদান করবে। সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক-ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রজাতি (by-catch) সহ আহরণযোগ্য সকল প্রজাতি বিষয়ক জরিপের জন্য উন্নত তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, FAO-এর সহায়তায় RV Dr. Fridtjof Nansen কর্তৃক পরিচালিত জরিপ ও গবেষণা ২০০ মিঃ অধিক গভীরতায় মৎস্য মজুদ/স্টক নির্ণয়, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা রাখছে। FAO-এর সহায়তায় এ ধরনের জরিপ ও গবেষণা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

এছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে ইলিশের পাশাপাশি অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উপস্থিতি, জীবন পরিক্রমা ও প্রজনন সময় নির্ণয়পূর্বক যথাযথ মৎস্য আহরণ কার্যক্রম সমন্বয় করা প্রয়োজন। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অনুন্মোচিত (untapped) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান এবং অধিক মৎস্য আহরণে ভূমিকা রাখবে যা সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাছাড়া, উপকূলীয় মৎস্যচাষ ও মেরিকালচার চালু করা হলে তা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করবে। মৎস্য আইন অমান্যকারীদের বিরূদ্ধে আইনী পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, টেকসই নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের জন্য যান্ত্রিক ফিশিং বোটের বিশাল সংখ্যা নিবন্ধনভুক্তকরণ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং আর্টিসানাল স্মল স্কেল ফিশারিতে নিয়োজিত জাহাজের/নৌকার কার্যকর তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব ও দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সরকারি সংস্থার সাথে সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি হচ্ছে টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ।

ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকার কারণে সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়নের অনেক সুযোগ অনুন্মোচিত থেকে যায়। বর্তমানে, বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে, সীমিত সংখ্যক বাণিজ্যিক ট্রলার (২৫৫ টি), বিপুল সংখ্যক যান্ত্রিক (৩২,৮৫৯ টি) এবং অযান্ত্রিক (৩৪,৮১০ টি) কাঠের তৈরি মৎস্য জাহাজ সমুদ্রে ও উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়োজিত থাকে। কাঠের তৈরি নৌকার/ জাহাজের মৎস্যজীবীগণ বিভিন্ন ধরণের বেআইনী জাল ব্যবহার করে অগভীর উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করে থাকে। আহরণের পর বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা মাঝারি ও বৃহদাকৃতির মাছ বাছাই করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে এবং অবশিষ্ট বিভিন্ন প্রজাতির লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতির সামুদ্রিক মাছের পোনা (fish fry)/ জুভেনাইলস (juveniles) মাছ সাগরে ছেড়ে না দিয়ে বোটের তলায় ও ঝুড়িতে ট্র্যাশ ফিশ (trash fish) হিসেবে মজুদ করে। পরবর্তীতে নৌকাগুলো/জাহাজগুলো তীরে ফিরে আসার পর স্থানীয় ক্রেতাদের নিকট মাছ বা মুরগীর খাবারের কাঁচামাল হিসেবে এ ধরণের সকল ট্র্যাশ ফিশ বিক্রয় করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক এ বিষয়ে অদ্যাবধি কার্যকর আইনী ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে, দিন দিন সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি হ্রাস পাচ্ছে যা বাংলাদেশের ভবিষ্যত টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য স্টক/মজুদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষতিকর।

সুনীল অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে বিশাল সমুদ্রাঞ্চল, সমুদ্রতীর ও উপকূলীয় জলরাশি অত্যন্ত সমন্বিত উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমুদ্র-খাদ্য সুরক্ষা (seafood safety) নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, খাতভিত্তিক এ ধরণের পদক্ষেপ অবশ্যই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং জনগণের জীবন ও জীবিকায় গুণগত পরিবর্তন আনবে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)-কে কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া, মজুদ/স্টক মূল্যায়ন/ নির্ণয়, উপাত্তের ঘাটতি পূরণ এবং গভীর সমুদ্র ভিত্তিক সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক জ্ঞানার্জন মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং মূল্যমানের তাৎপর্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। উল্লেখ্য যে, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ খাতে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে যা দেশের জনগণের প্রোটিনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১.২ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	যথাযথভাবে সামুদ্রিক মৎস্য স্টক নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পন্নকরণ এবং ডিএনএ বারকোডিং (DNA Barcoding) এর মাধ্যমে Pelagic ও Demersal প্রজাতিসমূহের সনাক্তকরণ	জরিপের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য স্টক/মজুদ মূল্যায়ন/ নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন। যথাযথ মেরিন মজুদ মূল্যায়ন/ নির্ণয়ের উদ্যোগ গ্রহণ ও সম্পন্নকরণের জন্য উন্নত ও আধুনিক জরিপ জাহাজ ভাড়া অথবা FAO-এর সাথে সমন্বয় করে বিনা খরচে জরিপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে করে সমুদ্রে মৎস্য স্টক/মজুদ সম্পর্কিত বিস্তারিত অনুসন্ধান করা যেতে পারে।	ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সমূহের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের অভাব বিদ্যমান।	মেরিন ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনায় বসতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন; ৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৫.সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ।	২০২০-২০৩০	জাহাজ ভাড়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪২১ কোটি টাকা (আনুমানিক)	বর্তমান সক্ষমতা অনুযায়ী অগভীর ২০০ কিমি উপকূলীয় এলাকায় আরভি মীন সন্ধানী কর্তৃক স্টক নির্ণয় কার্যক্রম চালু রাখা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা অন্যান্য সক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের জাহাজ যোগে ২০০ মিঃ এর অধিক গভীরতায় স্টক বা মজুদ নির্ণয়ের সময় উপযুক্ত বাংলাদেশী প্রতিনিধি প্রেরণ এবং গবেষণা ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে FAO-এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
২	প্রত্যেক প্রজাতির বার্ষিক সর্বোচ্চ আহরণসীমা (maximum allowable catch) নির্ধারণ	বার্ষিক সর্বোচ্চ আহরণসীমা নির্ধারণ বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে।	সর্বোচ্চ আহরণ সীমা বা মৎস্য আহরণের সুযোগের মাত্রা নির্ধারণ বিশেষত: বাণিজ্যিক মৎস্য স্টক নির্ধারণের বিষয়ে অদ্যাবধি কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দেশি এবং বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১০ মিলিয়ন/ ৮৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	কারিগরি সক্ষমতা সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য নরওয়ে এবং জাপানসহ অন্যান্য সক্ষম দেশসমূহের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশের মৎস্য স্টকের অবস্থা নির্ণয়ে FAO-এর সহযোগিতাও নেয়া যেতে পারে।

১.২ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৩	সমুদ্রে ট্র্যাশ ফিশ (trash fish) নিক্ষেপ হ্রাসকরণ	বর্তমানে আর্টিসানাল এবং অননুমোদিত কাঠের নৌকা ব্যবহারকারী জেলেরা ফ্রিজিং স্পেসের (Freezing Space) অভাবের কারণে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির সামুদ্রিক মাছের পোনা (fish fry)/ juveniles মাছ সাগরে ছেড়ে না দিয়ে বোটের তলায় ও ঝুড়িতে ট্র্যাশ ফিশ (trash fish) হিসেবে মজুদ করে। বিপুল পরিমানে ট্র্যাশ ফিশ আহরণ ও সাগরে নিক্ষেপ সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য এবং ভবিষ্যত টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য মজুদ ব্যবস্থাপনার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে।	জেলেদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর নয় এবং ট্র্যাশ ফিশ নিক্ষেপ হ্রাসকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি এবং উপকরণের অভাব রয়েছে।	১.সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যকরভাবে উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনায় বসতে পারে। ২.সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ ট্র্যাশ ফিশ নিক্ষেপ হ্রাসকরণের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ৩. অননুমোদিত আকারের জালের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বাংলাদেশ কোস্টগার্ড; ৪. এনজিওসমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১-২ মিলিয়ন/৯ থেকে ১৭ কোটি টাকা (আনুমানিক)	প্রাকৃতিক মজুদ বৃদ্ধির জন্য সামুদ্রিক মৎস্য জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন।
৪	ডিমওয়ালা মা বাগদা চিংড়ি ব্যবস্থাপনা	সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিমওয়ালা মা বাগদা চিংড়ি ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য আহরণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ চিংড়ি হ্যাচারিতে মানসম্মত পোনা উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।	অদ্যাবধি উল্লেখ যোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে টেকসই, মানসম্পন্ন ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পোনা উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ৩. মৎস্য অধিদপ্তর; ৪. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন; ৫. ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ০৫ মিলিয়ন/৪২ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা করবে।

১.২ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৫	নতুন ফিশিং বিচরণক্ষেত্র / চারণভূমি অনুসন্ধান	কতিপয় মৎস্য স্টক/মজুদ হতে মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এড়াতে নতুন ফিশিং বিচরণক্ষেত্র / চারণভূমি অনুসন্ধান, নতুন মৎস্য স্টক/মজুদ সনাক্তকরণ এবং মৎস্য স্টক মজুদ নির্ণয় করা হলে তা মৎস্য মজুদ/স্টক সংরক্ষণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।	অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	জরিপ জাহাজ ক্রয় বা ভাড়া করার মাধ্যমে অথবা বিদেশি জরিপ জাহাজের সহায়তায় বঙ্গোপসাগরে বিচরণক্ষেত্র/চারণভূমি অনুসন্ধান, স্টক সনাক্তকরণ ও নির্ণয়ের জন্য দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১০ মিলিয়ন /৮৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
৬	স্যাটেলাইটভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্ভাব্য মৎস্য আহরণের অঞ্চল চিহ্নিত করা	সম্ভাব্য মৎস্য আহরণের অঞ্চল চিহ্নিত করার মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা সরাসরি মৎস্যচারণ অঞ্চলে যেতে পারবে, যা তাদের যাতায়াত খরচ এবং সময় বাঁচাতে সহায়ক হবে।	ইতোপূর্বে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি সাফল্যের মুখ দেখা যায়নি।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্পারসোর যৌথ উদ্যোগে একটি সম্ভাব্যতা জরিপ চলমান রয়েছে। জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; ২. স্পারসো; ৩.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ০১ মিলিয়ন /৮.৫ কোটি টাকা (আনুমানিক)	মৎস্যজীবীদের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা যেতে পারে।

১.২ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৭	টুনা মাছ আহরণের লাইসেন্স প্রদান এবং ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ	আকর্ষনীয় রপ্তানি মূল্যের দরুন টুনা মাছ আহরণ বাংলাদেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র। এটা প্রোটিনেরও ভাল উৎস হতে পারে। দেশীয় চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।	বাংলাদেশ সম্প্রতি Indian Ocean Tuna Commission-এর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও টুনা মাছ আহরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। স্বল্প সংখ্যক লাইসেন্স প্রদান করা হলেও টুনা মাছ আহরণ উপযোগী জাহাজ তৈরি/সংগ্রহ করা হয়নি। তাছাড়া, মাছের আকার নির্ণয়, আহরণের অঞ্চল সনাক্তকরণ, মাদার ভেসেলে ফ্রিজিং, প্যাঁকে-জিং-এ রপ্তানি মান বজায় রাখা, দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব, নতুন রপ্তানি গন্তব্যস্থল এবং বাজার সন্ধান হলো কয়েকটি প্রধান চ্যালেঞ্জ।	সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য সক্ষম দেশ সমূহের সাথে বঙ্গোপসাগরে যৌথ মৎস্য আহরণ কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। বেসরকারি/ ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩.বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ৪.পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	মাঃ ডঃ ৫০ মিলিয়ন)/ ৪২১ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। টুনা মাছ আহরণ সুনীল অর্থনীতি বিকাশের নতুন দিগন্ত। সম্ভাব্য অঞ্চল নির্ধারণ এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক আকারের মাছের প্রাচুর্যতা নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি স্টাডি/গবেষণা হওয়া উচিত।

১.২ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৮	ফিশ ল্যান্ডিং স্টেশন (Landing Station)-এর আধুনিকায়ন এবং মোট মৎস্য আহরণের আধুনিক সেন্ট্রাল ডাটাবেজ তৈরি	ফিশ ল্যান্ডিং স্টেশন আধুনিকায়ন এবং সুবিন্যস্ত ডাটাবেজ মৎস্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।	সর্বমোট মৎস্য আহরণের ডাটাবেজ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সুবিন্যস্ত উপায়ে উপাত্ত সংগ্রহ করার কোন পদ্ধতি এখনও চালু হয়নি। উপরন্তু, অল্প সংখ্যক মৎস্য আহরণের তথ্য ডাটাবেজে সঠিকভাবে সন্নিবিশিত হয়না।	এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রয়োজন যার ফলে সকল আহরিত মৎস্য নির্দিষ্ট ল্যান্ডিং স্টেশনসমূহে ল্যান্ড করতে পারে এবং আহরিত মৎস্যের তথ্য-উপাত্ত সেন্ট্রাল ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সকল অংশীজনের সাথে পরামর্শ করে একটি কার্যকর উপায় বের করতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.বিএফ আরআই; ৩.বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; ৪.পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ২০ মিলিয়ন /১৬৮ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন। ন্যায্য বাজার দর নিশ্চিতকরণে ল্যান্ডিং স্টেশনে পর্যায়ক্রমে অনলাইন নিলামের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের নিকট হতে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।

২. সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়ন

২.১ প্রেক্ষাপট

মৎস্যচাষ (Aquaculture) শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রপ্তানি বাজারে মাছের উচ্চ চাহিদার দরুন এই শিল্প দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। বর্তমানে দেশে দুই ধরণের মৎস্যচাষ (Aquaculture) তথা স্বাদু পানির মৎস্যচাষ (Freshwater Aquaculture) এবং উপকূলীয় মৎস্যচাষ (Coastal Aquaculture) প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে এখনও সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়নি তবে Mariculture-কে জনপ্রিয় করে তোলা এবং এর বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর আওতায় কিছু পাইলট প্রকল্প ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্বাদু পানির মৎস্যচাষ (Freshwater Aquaculture) বলতে, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে তথা পুকুর /দিঘি, হাওড়, বাওড় ও অন্যান্য বদ্ধ জলাশয়ে প্রধানতঃ রুই জাতীয় মাছ, পাঙ্গাস, শিং, মাগুর, কই, তেলাপিয়া, পাবদা ও অন্যান্য মাছ চাষকে বোঝায় এবং উপকূলীয় মৎস্যচাষ (Coastal Aquaculture) বলতে, উপকূলীয় ঘেরে/পুকুরে মূলত চিংড়ি, কোরাল বা ভেটকি, পারশে ও কাঁকড়া ইত্যাদি চাষকে বোঝায়। বাংলাদেশে মৎস্যচাষ খাতে মূলত চার ধরনের পদ্ধতি বিদ্যমান আছে। যথা ১. সনাতন (extensive) পদ্ধতি; ২. উন্নত সনাতন (improved extensive) পদ্ধতি; ৩.আধা-নিবিড় (Semi-intensive) পদ্ধতি; এবং ৪. নিবিড় (intensive) পদ্ধতি। মৎস্যচাষ বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে নিবিড় পদ্ধতি চাষিদের কাছে জনপ্রিয় হচ্ছে। তবে এখনও খুব বেশি পরিসরে শুরু হয়নি। মেরিকালচার পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে ঘের দিয়ে খাদ্যের উৎস হিসেবে সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি তথা শক্ত খোলস বিশিষ্ট প্রাণি (shellfish), ফিন ফিশ (fin fish) এবং সামুদ্রিক শৈবাল চাষ করা হয়। বিগত ৪০ বছরে বাংলাদেশে মেরিকালচার পদ্ধতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ যেমন-চীন, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম অপেক্ষা পিছিয়ে রয়েছে। অথচ, বাংলাদেশে ঈষৎ লোনাপানির (Brackish) মাছ (বাগদা চিংড়ি, কাঁকড়া) এবং মেরিন প্রজাতির মাছ (সী-ব্যাস, ভেটকি, গ্রে-মুলেট, মুগিল সিফেলাস, গ্রীন-ব্যাক মুলেট, রূপচাঁদা, চাঁদা, ইলিশ, নোনা পানির তেলাপিয়া ইত্যাদি) সহ অপ্রচলিত (non-traditional) মেরিন প্রজাতি যেমন-সামুদ্রিক শৈবাল, ম্যাক্রো এ্যালগি (macro algae), শক্ত খোলস বিশিষ্ট প্রাণি (shellfish-অর্থাৎ ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি), সামুদ্রিক আর্চিন (sea urchin), সামুদ্রিক কিউকাম্বার (sea cucumber) ইত্যাদিও মেরিকালচার পদ্ধতিতে চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এলক্ষ্যে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে একটি মেরিকালচার ফার্মিং কর্তৃপক্ষ (Mariculture Farming Authority) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। উক্ত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সামূদ্রিক ও উপকূলীয় এলাকায় উপযুক্ত মেরিকালচার স্থান (site), প্রজাতি নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক বাজার বিপণনসহ মেরিকালচার প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহ যেমন-চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনাম হ্যাচারিতে উৎপাদিত মাছের পোনা ও প্রস্তুতকৃত খাবার ব্যবহার করে মেরিকালচার পদ্ধতিতে ফিন ফিশ চাষে এগিয়ে রয়েছে। এসব দেশ হতে অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা নেয়া যেতে পারে এবং সরকারের সুনীল অর্থনীতি উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার অধীনে বাংলাদেশে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ বিদ্যমান ও সনাক্তকৃত ফিন ফিশ, শক্ত খোলস বিশিষ্ট প্রাণি (shellfish) ও অপ্রচলিত মেরিন প্রজাতির মেরিকালচার শুরু করার জন্য অতি সত্ত্বর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। উপকূল ও নিকটবর্তী অফশোর অঞ্চলে মেরিকালচার কার্যকরভাবে উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল, পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ একসাথে আলোচনায় বসতে পারে।

মুক্তা একটি দুস্প্রাপ্য এবং মূল্যবান রত্ন। প্রাচীনকালে মুক্তা উৎপাদন সম্পর্কে মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না। তখন শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মুক্তাই সংগ্রহ করা হতো কিন্তু ঝিনুকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা উৎপাদন হতো খুব কম পরিমাণে। পরবর্তীতে চীন এবং জাপানে মুক্তা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবিত হয় এবং মুক্তার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে শুধু ধনী শ্রেণী নয় মধ্যবিত্তের পক্ষেও মুক্তা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। চীনের স্বাদুপানিতে বছরে প্রায় ৮০০-১০০০ মে.টন মুক্তা উৎপাদিত হয় যা পৃথিবীর মোট মুক্তা উৎপাদনের প্রায় ৯৫% এবং এর প্রায় অর্ধেকই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। গহনা তৈরি ছাড়াও মুক্তার অন্যান্য ব্যবহার রয়েছে।

স্বাদু পানির ঝিনুক থেকে মুক্তা উৎপাদনের ইতিহাস দু'হাজার বৎসর পূর্বের হলেও বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ শুরু হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। ছোট, অসমান আকৃতির রাইস পার্ল (Rice Pearl) চীনের মোট উৎপাদনের সিংহ ভাগ হলেও বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা এবং গবেষণার ফলে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন রং এবং আকৃতির মুক্তা উৎপাদন সম্ভব হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ বিশেষত ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনামেও মুক্তা চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে ঝিনুক থেকে মুক্তা আহরণ করা হয়ে থাকে। মুক্তাবাহী ঝিনুকের উপস্থিতি এবং ঝিনুকে মুক্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে দেশের জলাশয় এবং আবহাওয়া তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা মুক্তা চাষের জন্য সহায়ক। সুন্দরবনের ভিতরে ছোট ছোট খাল ও জলাশয় রয়েছে যা কিনা মুক্তা চাষের জন্য উপযুক্ত। বিশ্ববাজারে মুক্তার যথেষ্ট কদর রয়েছে। অন্যদিকে, প্রকৃতি থেকে মুক্তা আহরণের মাধ্যমে প্রতি বছর অসংখ্য ঝিনুক বিনষ্ট করে জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাই গবেষণার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত উপায়ে মুক্তা চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে চাহিদা অনুযায়ী মুক্তা সরবরাহ করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং ঝিনুকের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব।

২.২ সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	সী-ব্যাস মৎস্য প্রজনন (Seabass breeding) ও চাষ	কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন মেরিকালচার উন্নয়ন ঘটাবে।	উল্লেখযোগ্য সী-ব্যাস মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারির অবকাঠামোগত উন্নয়ন অদ্যাবধি করা হয়নি।	অন্যান্য দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ পূর্বক দেশে সী-ব্যাস মৎস্য হ্যাচারি ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সী-ব্যাস প্রজনন ও চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের উদ্যোগও গ্রহণ করতে হবে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন এবং মেরিন স্টেশন।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৪.০ মিলিয়ন/ ৩৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে সমুদ্রের উপকূল ও নিকটবর্তী অফশোর (Offshore) অঞ্চলে মেরিকালচার উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
২	অফশোর এলাকায় খাঁচায় ইলিশ চাষ (Offshore Hilsha cage Culture)	খাঁচায় ইলিশ চাষ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। বঙ্গোপসাগর এবং তদসংলগ্ন নদী প্রবাহ যেখানে ডিম পাড়ার সময় ইলিশ মাছের ঝাঁক বিচরণ করে থাকে সেখানে ইলিশ মাছ চাষ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।	১. প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রভাব; ২. অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	১. সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত যৌথ ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। ২. অন্যান্য দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩. দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। ৪. বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ একযোগে কাজ করতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.মৎস্য অধিদপ্তর; ৩.বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন এবং মেরিন স্টেশন; ৪.ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম। ৫.সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৫.০ মিলিয়ন/ ৪২ কোটি টাকা (আনুমানিক)	ইলিশ মাছ চাষ বৃদ্ধি করা গেলে সারাবছর মাছের সরবরাহ বজায় থাকবে যা জনগণের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য, নরওয়ে ২০০৮ সাল থেকে স্যামন (Salmon) মাছের জন্য এই ধরণের উদ্যোগ নেয়ার ফলে বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম স্যামন রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

২.২ সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৩	মুলেট প্রজনন (Mullet breeding) ও কালচার	কৃত্রিম প্রজনন ও বহুসংখ্যক পোনা উৎপাদন মেরিকালচার উন্নয়ন ঘটাবে।	মুলেট মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারির উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অদ্যাবধি করা হয়নি।	১. বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ যৌথভাবে কাজ করতে পারে। ২. সমুদ্রের উপকূল ও নিকটবর্তী অফশোর অঞ্চলে মেরিকালচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন এবং মেরিন স্টেশন; ৪. ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম; ৫. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৪.০ মিলিয়ন/ ৩৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	অন্যান্য দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪	সামুদ্রিক মা চিংড়ি চাষ এবং এসপিএফ (Specific Patahogen Free) পোনা উৎপাদন ও চাষ	নির্ধারিত চিংড়ি হ্যাচারিতে সামুদ্রিক মা চিংড়ি চাষ এবং কক্সবাজার ও অন্যান্য এলাকার চিংড়ি খামারে এসপিএফ পোনা উৎপাদন সহ সুনির্দিষ্ট চিংড়ি প্রজনন কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।	অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ যৌথভাবে কাজ করতে পারে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন; ৩. ফ্যাকাল্টি অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; ৪. ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্সেস টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; ৫. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৪.০ মিলিয়ন/ ৩৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	অন্যান্য দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.২ সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৫	কাঁকড়া প্রজনন ও নরম খোলস বিশিষ্ট কাঁকড়া চাষ	নরম খোলস বিশিষ্ট কাঁকড়া চাষ সম্প্রতি শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মহেশখালী ও কক্সবাজার অঞ্চলের উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।	প্রাকৃতিক ভাবে প্রাপ্ত বীজ/পোনা ব্যবহৃত হচ্ছে; কিন্তু অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য তেমন কোন হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।	বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ যৌথভাবে কাজ করতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন এবং মেরিন স্টেশন; ৪.ফ্যাকাল্টি অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; ৫.বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ৬. সংশ্লিষ্ট বিশ্বদ্যিালয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৪.০ মিলিয়ন/ ৩৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নতমানের কাঁকড়া রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ করতে পারে। অন্যান্য সক্ষম দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৬	সামুদ্রিক শৈবাল চাষ (Seaweed mariculture)	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক শৈবাল চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	অদ্যাবধি পর্যাপ্ত কার্যকরী বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	১. বাংলাদেশের জলসীমায় চাষযোগ্য ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক শৈবাল (Seaweed) প্রজাতি সনাক্তকরণ ও পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ চালু করা যেতে পারে। ২. সামুদ্রিক শৈবাল চাষের জন্য নরওয়ে, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানসহ অন্যান্য সক্ষম দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.মৎস্য অধিদপ্তর; ৩. বিএফআরআই এর নোনা পানির স্টেশন এবং মেরিন স্টেশন; ৪.ফ্যাকাল্টি অব মেরিন সায়েন্সেস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ৫. সংশ্লিষ্ট বিশ্বদ্যিালয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৪.০ মিলিয়ন / ৩৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সামুদ্রিক শৈবাল অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি মানুষের খাদ্য ও জাপানি খাবার Sushi- এর মোড়ক/আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যান্য দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.২ সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৭	সামুদ্রিক মৎস্য চাষের জন্য উপযুক্ত অঞ্চল সনাক্তকরণ	স্বাদু পানির অ্যাকুয়াকালচারে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ হলেও মেরিকালচারে তেমন কোন অগ্রগতি নেই। বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রজাতিগুলোর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন বাংলাদেশে মেরিকালচারের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে।	উন্মুক্ত সমুদ্র এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্রবাহ থেকে বিপুল পরিমাণে কাদাবালির নিঃসরণের জন্য বাণিজ্যিকভাবে টেকসই মেরিন প্ল্যান্ট এবং মাছের প্রজাতির কালচারের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন একটি চ্যালেঞ্জ।	দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ সক্ষম দেশ সমূহের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করা যেতে পারে।	১.মৎস্য অধিদপ্তর; ২.বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট; ৩. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ; ৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৪ মিলিয়ন/ ৩৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সমুদ্রে মৎস্য চাষের জন্য নির্ধারিত স্থান যেন নৌ চলাচলে বাধা সৃষ্টি না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যান্য সক্ষম দেশসমূহ হতে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেইসব দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।
৮	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুক্তার চাষ	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুক্তার চাষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে। সুন্দরবনের ভিতরে ছোট ছোট খাল ও জলাশয় রয়েছে যা কিনা মুক্তা চাষের জন্য উপযুক্ত।	১. দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তির অভাব; ২. শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাব; ৩. মুক্তা চাষের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অভাব; ৪. ঝিনুকের জীববিদ্যা বিশেষ করে বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্তকরণ ও এসব অঙ্গের কার্যকারিতার বিষয়ে জ্ঞানের অভাব।	১.দীর্ঘমেয়াদী মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ২. সুন্দরবন এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ৩.বৃহত্তর সিলেটের হাওড় এলাকায় যেখানে গলদা চিংড়ি ভালো জন্মে না অথচ ঝিনুকের প্রাচুর্য বেশি সেসব এলাকায় খাঁচাতে প্রণোদিত উপায়ে ঝিনুকে মুক্তা চাষ বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ৩. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ; ৪.বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণির খাদ্য হিসেবেও ঝিনুক ব্যবহৃত হয়। ঝিনুকের তৈরি মূল্যবান ও আকর্ষণীয় সামগ্রীর মধ্যে লাইটশেড, ঝাড়বাতি, পর্দা, চাবির রিং, টেবিল ল্যাম্প, ঝাড়ু, ফুল, অ্যাশট্রে, কানের দুল, মালা, হাতের চুড়ি, চুলের ক্লিপসহ বিভিন্ন ধরনের পুতুল, পশু-পাখির মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২.২ সামুদ্রিক মৎস্যচাষ (Mariculture) উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৯	কৃষক, গ্রামীণ মহিলা এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ে মুক্তা চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	মুক্তা চাষের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ গ্রামীণ মহিলা, কৃষক ও বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে মুক্তা উৎপাদনের জন্য ঝিনুক চাষ তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি।	বাংলাদেশের মুক্তা চাষ অঞ্চলে স্থাপিত মডেল মুক্তা উৎপাদন প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ খামার থেকে চাষীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের নিজ এলাকায় মুক্তা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; ৩. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ; ৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ৫.মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	গ্রামীণ পর্যায়ে মুক্তা চাষে উৎসাহ প্রদানপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই খাতকে ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক শিল্পে পরিণত করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৩. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping)-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৩.১ প্রেক্ষাপট

নৌপরিবহন তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী পরিবহন ব্যবস্থা। বিশ্বের প্রায় ৯০% বাণিজ্যিক পণ্যাদি সমুদ্রপথে পরিবহন করা হয়। ফলে, নৌপরিবহন শিল্প বিশ্বের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখে। তাছাড়া, এ শিল্প বন্দর ও জাহাজ ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় অর্থনীতিতেও প্রত্যক্ষ অবদান রাখে। স্বাধীনতার পর থেকেই নৌপরিবহন ব্যবস্থা বাংলাদেশের বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিশেষ করে বস্ত্রখাতে প্রবৃদ্ধির কারণে নৌপরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট আমদানি ছিল ৬৮.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রপ্তানি ছিল ৪১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লিখিত মোট বাণিজ্যিক পরিবহনের ৯৫% এর অধিক সমুদ্রপথে এবং ৩টি প্রধান সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। ৩০০০ এর অধিক জাহাজ এই পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং ভাড়া হিসেবে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক পরিশোধিত হয়েছিল। মংলা বন্দর ও নতুন চালু হওয়া পায়রা বন্দরের তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বেশীরভাগ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, চ্যানেল ড্রাফটের (Channel Draft) সীমাবদ্ধতার কারণে ৯ মিটারের অধিক ড্রাফটের কার্গো বা অন্যান্য জাহাজের কার্যক্রম লাইটারেজ জাহাজ (Lighterage Vessel) যোগে বহিঃনোঙ্গর (Outer Anchorage) বা কুতুবদিয়া নোঙ্গর (Anchorage) হতে পরিচালনা করা হয়। অন্যদিকে, পণ্য পরিবহন ব্যয় হ্রাসের জন্য ও মেগা লাইনারদের একীভূত হওয়ার কারণে জাহাজের আকৃতি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হচ্ছে। এ কারণে আমাদের বন্দরগুলোর বর্তমান সক্ষমতা দিয়ে জাহাজগুলোকে পরিপূর্ণ সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

ধারণা করা হচ্ছে যে, আগামী ২০৪৩ সালের মধ্যে জাহাজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ কেবলমাত্র চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ১৪ মিলিয়ন টিইইউ কার্গো হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা অর্জন করবে। ২০১৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দর ৩ মিলিয়ন-টিইইউ ক্লাবে পৌঁছেছে। এমতাবস্থায়, বন্দর সুবিধা সম্প্রসারণ এবং দেশীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সময়ের দাবী। বর্তমান বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনা করে সরকার উপকূল বরাবর বিভিন্ন কৌশলগত অবস্থানে খাতভিত্তিক বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone), বে-টার্মিনাল (Bay Terminal), কয়লা ভিত্তিক মেগা পোর্ট, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল ও মাতারবাড়ি কমার্শিয়াল টার্মিনাল নির্মাণের মেগা প্রজেক্ট (Mega Project) গ্রহণ করেছে। এছাড়া, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর এলাকা সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পাশাপাশি, প্রতিবেশী দেশের স্থলবেষ্টিত প্রদেশসমূহে পণ্য পরিবহনে চট্টগ্রাম বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে, বাণিজ্যিক নৌপরিবহন দ্বারা সমুদ্র ব্যবহারের সর্বাধিক সুফল পেতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সড়ক, রেল ও নৌ সংযোগের উন্নয়ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

বর্তমান সরকার প্রাধিকার ভিত্তিতে বিগত ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাতারবাড়িতে বাণিজ্যিক টার্মিনালের কাজ আনুষ্ঠানিক-ভাবে শুরু করেছে। আশা করা যায় যে, ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন এই বন্দরের কাজ শেষ হলে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক নৌপরিবহন খাত আরও সমৃদ্ধ হবে।

৩.২ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping)-এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	সমন্বিত নৌপরিবহন নীতি প্রণয়ন	বাংলাদেশের বাণিজ্যিক নৌপরিবহন খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সমন্বিত এবং যুগোপযোগী নৌপরিবহন নীতি প্রণয়ন এখন সময়ের দাবী।	বিগত সময়ে যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়নি।	প্রায়োগিক নৌপরিবহন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।	১.নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	সমুদ্র সম্পদ হতে সর্বাধিক সুফল পেতে একটি সমন্বিত এবং যুগোপযোগী নৌপরিবহন নীতি প্রণয়ন সর্বোচ্চ প্রাধিকারযোগ্য।
২	বন্দর সুবিধা সম্প্রসারণ	দ্রুত বর্ধনশীল বাণিজ্যিক নৌপরিবহন খাতকে পরিপূর্ন সেবা দিতে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	সরকারি পদক্ষেপের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ব্যবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা সহ সরকারি তদারকি সেল চালু করতে হবে। সরকারি পদক্ষেপের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ২.বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	এ ব্যাপারে বেসরকারি অংশগ্রহণ আহবান করা যেতে পারে।
৩	দেশী/ পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি	ট্রেড ভলিউম অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ কার্গো দেশী/পতাকাবাহী জাহাজ দ্বারা পরিবহনের সুযোগ রয়েছে যা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে।	বহুমুখী করারোপের কারণে স্থানীয় জাহাজ মালিকগণ নতুন জাহাজে বিনিয়োগে আগ্রহী নয়।	কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ট্যাক্স হলিডে/ প্রণোদনা চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ২. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন; ৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ৪. শিল্প মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	বিনিয়োগকারীদের যৌক্তিক মেয়াদে আকর্ষনীয় সুদে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
৪	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	লজিস্টিক সহায়তাসহ মেরিটাইম ক্লাস্টার (Maritime Cluster) সম্প্রসারণ করলে বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধি হতে পারে।	দক্ষ বন্দর ব্যবস্থাপনার অভাব নৌপরিবহন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে।	১. মানব সম্পদ উন্নয়ন সহ পর্যাপ্ত লজিস্টিক সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ২. ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিনিয়োগ/ অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ২. বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	এ ব্যাপারে বেসরকারি অংশগ্রহণ আহবান করা যেতে পারে।

৩.২ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping)-এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৫	মানব সম্পদ উন্নয়ন	কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি যথাযথ প্রশিক্ষণের দ্বারা দক্ষ/আধা-দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনাসহ নৌপরিবহনের সার্বিক মানোন্নয়ন সম্ভব।	অদ্যাবধি নাবিক বা শ্রমিকদের জন্য যুগোপযোগী ও আধুনিক প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।	১. শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে পর্যাপ্ত দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। ২. বিদ্যমান মেরিটাইম প্রশিক্ষণ সুবিধা, গবেষণা ও উন্নয়ন খাত সম্প্রসারিত করতে হবে এবং যুগোপযোগী ও আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ২. সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ; ৩. ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	বিদ্যমান ঘাটতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ সহ মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
৬	কন্টেইনার পরিবহন	বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা বাণিজ্য সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য অপ্রতুল। নৌপথে পণ্য পরিবহন সবচেয়ে সাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও পণ্য পরিবহনে এ মাধ্যমের ব্যবহার আশাব্যঞ্জক নয়।	অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পরিবহন ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও নৌপথ সম্প্রসারণ করা হয়নি।	১. অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে নৌপথ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। ২. বন্দর জট কমাতে অধিকতর আইসিটি/ অফডক/এসইজেড চালু করা প্রয়োজন।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ২.বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন; ৩. বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ব্যবস্থা উৎসাহিত করা যেতে পারে। এফবিসিসিআই, ডিসিসিআইসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসায়ী সংগঠনকে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

৩.২. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping)-এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৭	আধুনিক গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন	আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপনের অংশ হিসেবে রাস্তা/রেল/ এলএনজি টার্মিনাল (LNG Terminal) ইত্যাদি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন একটি গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপন করলে তা সামুদ্রিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে এবং ভবিষ্যতে আঞ্চলিক হাব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। 'দ্য বে অব বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট (The Bay of Bengal Industrial Growth Belt) শীর্ষক উদ্যোগের আওতায় জাপান সরকার মহেশখালীর মাতারবাড়িতে ইতোমধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জাহাজ ভিড়ার চ্যানেল ও টার্মিনালকে ঘিরে প্রাথমিক অবকাঠামো তৈরি করছে।	ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদার তুলনায় সমুদ্র বন্দর সমূহে আধুনিক অবকাঠামো/ সুবিধার অভাবের কারণে আমাদের সমুদ্র বন্দরগুলোর মান বিদেশি বন্দরগুলোর চাইতে অনেক কম।	১. আধুনিক গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ যাতে থাকবে Vessel Traffic Management System এবং অন্যান্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা; ২. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ২. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	আধুনিক গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা গেলে বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

৩.২. বাণিজ্যিক নৌপরিবহন (Commercial Shipping)-এর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৮	পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনালটি ২০১৩ সালে সরকারি অর্থায়নে (BIWTA & CPA যৌথভাবে) নির্মিত হয় এবং টার্মিনালটির হ্যান্ডেলিং ক্ষমতা বার্ষিক ১১৬০০০ TEUs। অভ্যন্তরীণ নদীপথ রুটে কন্টেইনার পরিবহন থেকে বা রেল পথের পরিবহনের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী হওয়ায় উক্ত টার্মিনালটির সক্ষমতা অনুযায়ী এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।	১. টার্মিনালটির সাথে সম্পৃক্ত সংযোগ সড়ক বিশেষভাবে কালকিন্দি -হেমায়েতপুর (১৮ কিঃ মিঃ) ও পানগাঁও-হাসনাবাদ (৫ কিঃ মিঃ)-এর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব; ২. কন্টেইনার পরিবহনের জন্য সীমিত সংখ্যক জাহাজ।	১. কালকিন্দি-হেমায়েতপুর ১৮ কিঃ মিঃ রাস্তা ৪ লেন-এ উন্নীতকরণ; ২. পানগাঁও-হাসনাবাদ ৫ কিঃ মিঃ রাস্তা ৪ লেন-এ উন্নীতকরণ; ৩. জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; ৩. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ; ৪. বিআইডব্লিউটিএ।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	আঞ্চলিক যোগাযোগ ও কন্টেইনার পরিবহনের সম্ভাবনার বিবেচনায় টার্মিনালটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৪. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Marine Tourism)-এর বিকাশ সাধন

৪.১ প্রেক্ষাপট

অভিজাত শ্রেণী ও বিত্তশালীদের অবকাশযাপন হিসেবে বৈশ্বিক সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে সারাবিশ্বে ভ্রমণ ও পর্যটনের দ্রুতবর্ধনশীল ক্ষেত্র হিসেবে সমুদ্রভ্রমণ সব শ্রেণীর ভ্রমণকারীদের নিকট প্রিয় অবকাশযাপনে পরিণত হয়েছে। আধুনিক সমুদ্রভ্রমণ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক ভ্রমণের দুর্ভোগ থেকে পর্যটকদের মুক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ধারণা করা হয় যে, সমুদ্রভ্রমণ পরবর্তী দশকে পর্যটন শিল্পের পথিকৃত হিসেবে স্থান করে নেবে। ২০১৮ সালে ২৮ মিলিয়নেরও অধিক ভ্রমণকারী অবকাশযাপন হিসেবে সমুদ্রভ্রমণকে বেছে নিয়েছিল। এ খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় ২০১৯ সালে সাগরে অতিরিক্ত ১৯টি নতুন পর্যটক জাহাজ সংযুক্ত হয়েছিল।

সমুদ্রভ্রমণ পর্যটকদের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জলপথে যোগাযোগের মাধ্যমে সারা বিশ্বের জনগণকে কাছে নিয়ে আসার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এই অঞ্চলে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ সমুদ্রভ্রমণ মানচিত্রে যার স্থান নেই। ফলে, সমুদ্রভ্রমণ মানচিত্রে স্থান করে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ বাংলাদেশের সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি বাংলাদেশ জাহাজের পর্যটকদের জন্য মানসম্মত ও উপযুক্ত ইমিগ্রেশন, রাজস্ব, কাস্টমস ও অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে পারে, তবে তা এ শিল্প সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। পুরো কার্যক্রম দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনা করা গেলে তা ক্রুজ সেবা প্রদানকারী কোম্পানীগুলোকে তাদের সমুদ্রভ্রমণ মানচিত্রে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করবে। আঞ্চলিক ক্রুজ জাহাজের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ৪৫টি ক্রুজ জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর চলাচল করে (অক্টোবর থেকে এপ্রিল)। মূলতঃ ভারতের প্রধান বন্দর সমূহ যেমন-মুম্বাই, গোয়া ও কোচি অভিমুখে এ সকল জাহাজ চলাচল করে থাকে। বড় জাহাজগুলো শ্রীলংকায় চলাচল করে এবং বাংলাদেশে প্রবেশ না করে সরাসরি ইয়াংগুন অভিমুখে যাত্রা করে।

সমুদ্রভ্রমণ দেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যা প্রত্যক্ষভাবে সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নে অবদান রাখবে। বৈশ্বিক সমুদ্র ক্রুজ মানচিত্রে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকরণ পর্যটন শিল্পে নতুন যুগের সূচনা করবে। বিলাসবহুল অ্যাডভেঞ্চার ক্রুজ 'সিলভার সী (Silversea)' ২০১৭ সালে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে আগমন করে এবং ২০১৯ সালে 'সিলভার ডিসকাভারার (Silver Discoverer)' মহেশখালী দ্বীপ এবং সুন্দরবন ভ্রমণ করে। ২০১৭ সালে সিলভার সী-এর সফর থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা (মাঃ ডঃ ৮১,০০০) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জিত হয়: যার মধ্যে অনলাইন ভিসা ফি বাবদ ৫.২৫ লক্ষ টাকা (মাঃ ডঃ ৬,৫০০), লজিস্টিক বাবদ ২০ লক্ষ টাকা (মাঃ ডঃ ২৫,০০০), সুন্দরবন বন বিভাগ হতে অনুমতি ফি বাবদ ১৫ লক্ষ টাকা (মাঃ ডঃ ১৮,৭৫০), মহেশখালী দ্বীপে ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা (মাঃ ডঃ ১২,৫০০-অটোরিক্সা ভাড়া, ২৪ স্পীড বোট, ২০০ ডাব, ২০০ চীপস ইত্যাদি)। এ ভ্রমণ থেকে কিছু কমিউনিটি বেনিফিটও (Community Benefit) অর্জিত হয়। তারা ৫ লক্ষ টাকা মুল্যমানের (মাঃ ডঃ ৬,২৫০-৪ ঘন্টায়) স্থানীয় হস্তশিল্প ক্রয় করে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যমানের (মাঃ ডঃ ৩,৭৫০) খেলাধুলা সামগ্রী যেমন-ক্রিকেট ব্যাট, প্যাড, বল, উইকেট, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি দান করে।

পর্যটকদের আরামদায়ক এবং নিরাপদ ভ্রমণের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা (One Stop Service) প্রদান করা প্রয়োজন। আমাদের ভিসা নীতিতে বিমানবন্দর ও স্থল বন্দরের পাশাপাশি সমুদ্র ও নদী বন্দরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ক্রুজ জাহাজে অন-অ্যারাইভাল ভিসা, অন-বোর্ড ইমিগ্রেশন, অন-বোর্ড কাস্টমস্ আনুষ্ঠানিকতা নিশ্চিত করতে হবে এবং বন্দর সুবিধা বিশেষতঃ জেটি (Jetty), ফেন্ডার (Fender) ও বার্থিং (Berthing) বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি তদারকি সেল চালু করতে হবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে এ ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট (Focal Point) হিসেবে কাজ করতে হবে। বিদেশী পর্যটকদের কাছে সার্বিক নিরাপত্তা সবসময়ই মুখ্য বিষয়। তাই, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাকে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যৌথভাবে একে অপরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মর্যাদাপূর্ণ ক্রুজ গন্তব্যস্থল হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রচারণা কার্যক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

যদি বাংলাদেশ জাহাজের পর্যটকদের জন্য মানসম্মত ও উপযুক্ত অন-বোর্ড ইমিগ্রেশন, কাস্টমস্ ও অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে পারে, তবে তা এ শিল্প সম্প্রসারণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে এবং দেশে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

৪.২ সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Marine Tourism)-এর বিকাশ সাধনের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	জাহাজে অন-বোর্ড ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস্ ব্যবস্থা চালুকরণ	ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের মাধ্যমে পর্যটকদের অন-বোর্ড ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস্ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশ ক্রুজ গন্তব্যস্থল হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস সুবিধার অভাব।	১.ভিসা নীতিতে সমুদ্র ও নদী বন্দরকেও অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধন করতে হবে। ২.ওয়ান স্টপ সেবা চালু করতে হবে এবং তা বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড কর্তৃক পরিচালনা করতে হবে।	১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ২. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ৫. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণা-লয়/বিভাগ/ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে যথাযথ স্টাডি এবং গবেষণা করে উন্নত বিশ্বের আদলে ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যটনে উন্নত দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।
২	কক্সবাজারে বিশ্বমানের মেরিন অ্যাকুরিয়াম স্থাপন	কক্সবাজারে একটি আধুনিক ও বিশ্বমানের মেরিন অ্যাকুরিয়াম দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের নিকট আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে।	বাংলাদেশে বিশ্বমানের কোন মেরিন অ্যাকুরিয়াম নেই। তদুপরি, উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং তার জন্য তহবিল সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য।	১.যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। ২.ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভুক্ত কোন দেশ, চীন বা অন্য সক্ষম কোন রাষ্ট্রকে সহযোগী দেশ হিসেবে নির্ধারণ করে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।	১. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; ২. বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৩০ মিলিয়ন/ ২৫০ কোটি টাকা (আনুমানিক)	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর গবেষকরা নানান প্রজাতির মেরিন প্ল্যান্ট এবং জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কিত অধিকতর জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে বিশ্বমানের মেরিন অ্যাকুরিয়াম স্থাপনে সহায়তা করতে পারেন।

৪.২ সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Marine Tourism)-এর বিকাশ সাধনের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৩	ডলফিন ও তিমি দর্শন, তাদের আবাস স্থানসমূহ চিহ্নিত-করণ এবং উপস্থিতির বাৎসরিক সময়কাল নির্ধারণ	শ্রীলঙ্কার ন্যায় ডলফিন ও তিমি জাতীয় প্রাণী দর্শন এদেশেও পর্যটক আকর্ষণের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে।	১. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ডলফিন ও তিমির আবাস এলাকা এবং বছরের কোন সময় তাদের উপস্থিতি বিদ্যমান, এ বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের অভাব; ২. দ্রুতগামী (জেট চালিত) পর্যটন জাহাজের অভাব।	১. এ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবাসস্থল, বাৎসরিক উপস্থিতির সময়কাল বের করার পাশাপাশি দ্রুতগামী পর্যটন জাহাজ তৈরি/ ক্রয় করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিতে হবে। ২. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-কে উৎসাহিত করতে হবে।	১.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২.প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; ৩.বাংলাদেশ নৌবাহিনী; ৪. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; ৫. বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট; ৬. মৎস্য অধিদপ্তর।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ৪ মিলিয়ন/ ৩৪ কোটি টাকা (আনুমানিক)	বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ডের জাহাজগুলো সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী সনাক্তকরণে সাহায্য করতে পারে।
৪	কোরালের অস্তিত্ব রক্ষায় মেরিন ইকোপার্ক ঘোষণা	সেন্টমার্টিন দ্বীপকে মেরিন ইকোপার্ক হিসেবে সংরক্ষণ এবং কোরালের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতের ইকো-পর্যটন এর পথ সুগম হবে।	আমাদের একমাত্র কোরাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন হুমকির সম্মুখীন। অনিয়ন্ত্রিত বসবাস এবং পর্যটন কোরাল এবং জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।	১. কোরালের অস্তিত্ব রক্ষায় যথাযথ গুরুত্বারোপ এবং প্রাধিকার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ২. সেন্টমার্টিন দ্বীপকে মেরিন ইকোপার্ক হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নিতে হবে।	১.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২.বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; ৩.বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট; ৪.বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ৫.সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমুহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১০ মিলিয়ন/ ৮৫ কোটি টাকা (আনুমানিক)	বিদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা যেতে পারে। থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়াসহ অন্যান্য সক্ষম দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশ সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পূর্বক ইকো-পর্যটনে এগিয়ে আসতে পারে।

৫. অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Offshore Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়ন

৫.১ প্রেক্ষাপট

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের এই বাংলাদেশে সমুদ্রের তলদেশেও রয়েছে বহু মূল্যবান সম্পদ। সে সকল সম্পদের মধ্যে অন্যতম হলো জ্বালানি গ্যাস ও তেল। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় এই সকল জ্বালানির বৃহৎ ভান্ডার আগামী দিনের জ্বালানি সংকট সমস্যাকে মোকাবিলা করতে অনেকাংশে সাহায্য করবে বলে মনে করা হয়। বঙ্গোপসাগরের এই সম্পদকে কাজে লাগানোর অভিপ্রায় নিয়ে পেট্রোবাংলা দেশের সমুদ্রাঞ্চলকে ২৬টি ব্লকে ভাগ করেছে যার মধ্যে ১১টি পড়েছে অগভীর আর ১৫টি পড়েছে গভীর সমুদ্রাঞ্চলে। এরই মধ্যে মডেল পিএসসি-২০১২ কে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে মডেল পিএসসি ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে আলোকে অফশোরে নতুন বিডিং রাউন্ড শুরু করার প্রাক-প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলছে। পিএসসি ব্লক SS-04 এবং SS-09 এর অপারেটর ONGC Videsh Limited (OVL) ব্লকদ্বয়ে দ্বি-মাত্রিক সাইসমিক জরিপ ও ইন্টারপ্রিটেশনের কাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী ব্লক SS-04-এ আরও একটি অনুসন্ধান কূপ (তিতলি-১) ও ব্লক SS-09-এ একটি অনুসন্ধান কূপ (মৈত্রী-১) খননের লক্ষ্যে কূপ খনন এলাকায় Geohazard Study'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে Integrated/Turnkey basis এ অফশোর কূপ তিতলি-১ ও মৈত্রী-১ খননের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে ২২টি ব্লকে মোট ৩২,০০০ লাইন কিলোমিটার 2D Non-Exclusive Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার জন্য TGS-SCHLUMBERGER JV এবং পেট্রোবাংলার মধ্যে গত ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। First Phase-এর কর্মকান্ড হিসাবে TGS বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে ১৩,৬০০ লাইন কিলোমিটার সাইসমিক সার্ভে করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া TGS সমুদ্রাঞ্চলে Environmental Impact Assessment (EIA) করার জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশি পরামর্শক নিয়োগ করেছে এবং তারা বর্তমানে EIA কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে NOC সংগ্রহের কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এই সকল ব্লক থেকে তেল-গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে পারলে তা দেশের জ্বালানি সমস্যা দূরীকরণে প্রভূত সাহায্য করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রাধীন সাগরের তলদেশে গ্যাস হাইড্রেটসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ তথা খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেট মজুদের সম্ভাবনার বিষয়ে ভারত ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে অর্থাৎ বাংলাদেশের জলসীমায় সমুদ্রের তলদেশে এবং মহীসোপানের ঢালে বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি ও মজুদের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যা বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। মহীসোপানে বাংলাদেশের দাবী পেশসংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রস্তুত করার নিমিত্ত ২০০৮ এবং ২০১০ সালে সম্পন্নকৃত সাইসমিক জরিপ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল জরিপসমুহের মাধ্যমে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকৃত জলসীমায় গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি, অবস্থান, প্রকৃতি ও মজুদ নির্ণয় করার জন্য একটি ডেস্কটপ স্টাডি বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ লক্ষ্যে গঠিত ডেস্কটপ স্টাডি গ্রুপটি যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটনে অবস্থিত ন্যাশনাল ওশেনোগ্রাফি সেন্টারের সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে।

প্রায়োগিক বিজ্ঞানের বিস্তৃত পরিসর নিয়ে বায়োটেকনোলজি গঠিত যা নানাবিধ জৈবিক পদ্ধতি, জীব প্রজাতি বা তাদের অনুরূপ জাত ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন কোন সামগ্রী উদ্ভাবন বা রূপান্তরকরণ অথবা গাছপালা এবং মৎস্য ও প্রানিকূলের জাত উন্নতকরণ বা বিশেষ কোন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব রূপান্তর সাধন করে থাকে। সেই আঠারো শতক থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে এন্টিবায়োটিকস্ (Antibiotics), প্রসাধনী সামগ্রী, ভ্যাকসিন (Vaccine) ও এনজাইম (Enzyme) উৎপাদন এবং উন্নত মৎস্য ও প্রাণির জাত উদ্ভাবনে ও বৃক্ষ বৈচিত্র্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বায়োটেকনোলজির নানাবিধ কৌশল

নির্ধারণ ও প্রয়োগে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বায়োটেকনোলজি কৃষি, মৎস্যচাষ, প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য খাতের কল্যাণে বায়োটেনোলজি ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে; এবং আধুনিক উন্নত কৌশলসমূহ তথা জিন-ভিত্তিক বায়োটেকনোলজি (Gene-based Biotechnology) মানব সভ্যতার জন্য ফলপ্রসূ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সমুদ্রের বহুসংখ্যক চিহ্নিত অর্থনৈতিক খাতের মধ্যে সামুদ্রিক বা সুনীল বায়োটেকনোলজি অন্যতম। সংজ্ঞানুযায়ী, সুনীল বায়োটেকনোলজি বলতে, সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে টেকসই উপায়ে সমাধান প্রদানের জন্য আণবিক (Molecule) পর্যায়ে সামুদ্রিক জৈব সম্পদের বাস্তুসংস্থান ও ব্যবহারিক প্রয়োগকে বুঝায়। সামুদ্রিক প্রাণিজ সম্পদের জীববৈচিত্র্য বিবেচনায়, সমুদ্রকে এ সকল বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভাবনাময় ভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ সকল সম্পদ নিয়ে গবেষণা করার সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে এ ধরণের সামুদ্রিক অণুজীবের বৃহত্তর অংশ অজানা থেকে যায়। তথাপি, বিগত দশকগুলোতে সমুদ্রবিজ্ঞানে নানাবিধ প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সমুদ্রের অজানা অংশে মানুষের প্রবেশ শুরু হয়েছে। এর ফলে সামুদ্রিক অণুজীবের ব্যবহারের হার বা বিবিধ বায়োটেকনোলজিক্যাল ক্ষেত্রে সামুদ্রিক প্রাণিজ অনুজীব হতে আহরিত নিউক্লিক এসিডের সিকুয়েন্স (Sequence) বের করার হার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, খাদ্য, জ্বালানি, মৎস্যচাষ, কসমেটিকস্, শিল্প, দূষণ প্রতিষেধক (Bioremediation) ও সামুদ্রিক পরিবেশগত সেবা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনীল বায়োটেকনোলজি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

রাষ্ট্রীয় সমুদ্রাঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস-এর উপস্থিতি নির্ণয় এবং পরবর্তীতে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে তা মেরিন বায়োটেকনোলজির নানাবিধ খাতে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারবে। এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের পরে তা থেকে অর্জিত জ্ঞান কসমেটিক্স তৈরি এবং দেশীয় বায়োটেকনোলজির নানাবিধ খাতে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলের মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস হতে প্রাপ্ত অর্থের সুষম বন্টন এবং এ বিষয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের যথাযথ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য জাতিসংঘে বর্তমানে যে আন্তর্জাতিক আইনি দলিল প্রস্তুত-করণের কাজ চলছে তাতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

সুনীল বায়োটেকনোলজি বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ইতোমধ্যে অনেক সম্ভাবনাময় পণ্য ও সেবার উদ্ভাবন এবং উন্নতিতে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। এ সকল পণ্যের মধ্যে (ক) স্বাস্থ্য উপখাতে: বিভিন্ন জৈব উপাদান এবং ঔষধ ব্যবহার করা হয় ক্যান্সার প্রতিরোধক, নতুন নতুন এন্টিবায়োটিকস্, ক্ষতস্থান ড্রেসিং এবং মেডিক্যাল পলিমার (Medical polymer) উন্নত-করণে; (খ) খাদ্য উপখাতে: প্রিবায়োটিকস্ (Prebiotics), ওমেগা-৩ সাপ্লিমেন্ট (Omega-3 Supplement), জেলি জাতীয় খাদ্য (Food jelly), ফোমিং এজেন্ট (Foaming agent) ইত্যাদির সহায়ক হিসেবে ব্যবহার হয় ফাংশনাল ফুড (Functional food) এবং সমুদ্রজাত খাদ্য (Marine food products) (গ) মৎস্যচাষ উপখাতে: জেনেটিক্যালি তৈরি শস্যদানা (Genetical-ly improved strains), জলজ উদ্ভিজ তৈল এবং রঁজক মিশ্রিত মাছের খাদ্য (pigments in feed) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় মাছের উন্নত জাতের খাদ্য এবং বীজ প্রস্তুতকরণে, চিকিৎসা গুণসম্পন্ন দ্রব্যাদি তৈরিতে এবং মৎস্যচাষ পদ্ধতি উন্নয়নে; (ঘ) জ্বালানি উপখাতে: ম্যাক্রো ও মাইক্রো এ্যালগি ব্যবহৃত হয় নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে; মাইক্রো বায়াল তেল পুনরুদ্ধারকারী সামগ্রী ব্যবহৃত হয় বায়োথাইনল তৈরিতে; সামুদ্রিক শৈবাল থেকে বায়ো-ফুয়েল, মাইক্রো এ্যালগি থেকে চিনি ও ফ্যাট জাতীয় দ্রব্যাদি এবং তৈল পুনরুদ্ধারকারী দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণে; (ঙ) প্রসাধনী উপখাতে: ফাংশনাল দ্রব্যাদি (Functional Ingredients), সামুদ্রিক ঝিনুক দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় অতি বেগুনি (Ultra violet) ফিল্টার, সানবার্ণ প্রতিরোধক ও সামুদ্রিক মুক্তা হতে প্রসাধনী প্রস্তুতিতে; (চ) সামুদ্রিক পরিবেশ উপখাতে: দূষণ প্রতিষেধক (Bioremediation), দূষণ মুক্তকরণ (De-pollution), এন্টিফউলিং (Anti-fouling) এজেন্ট ব্যবহৃত হয় বিষাক্ত রঁজক পদার্থ দূরীকরণে এবং সাগরের পানি থেকে তৈল ও অপদ্রব্য দূরীকরণে; (ছ) শিল্প উপখাতে: জৈব আঠা (Bio-adhesive) এবং জৈব-পরিশোধনকারী পণ্যাদি (Bio-refinery products) মৎস্য/প্রাণির খাদ্য এবং বায়োডিজেল (Bio-diesel) ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

সুনীল বায়োটেকনোলজি হল বায়োটেকনোলজির একটি বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে নতুন নতুন জীব প্রজাতির উদ্ভাবন, দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দরুন সৃষ্ট মানব ক্যান্সার ও আর্থ্রাইটিস রোগের নিয়ন্ত্রণ, জৈব উপাদান, মাইক্রো (লাল সামুদ্রিক শৈবাল) ও ম্যাক্রো শৈবাল (সবুজ এবং সায়ানোব্যাকটেরিয়া) থেকে জৈবইথানল (Bioethanol), সামুদ্রিক মুক্তা হতে প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চপ্রযুক্তিগত গবেষণা সম্পাদন করার লক্ষ্যে আণবিক যন্ত্রপাতি ও কৌশল ব্যবহার করে বায়োডিজেল (Bio-diesel) তৈরিকরণ, জৈবজ্বালানি (Biofuel) প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার অব এক্সেলেন্স (Centre of Excellence) হিসেবে কাজ করতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বায়োটেকনোলজি পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী উল্লিখিত উপ-খাতসমূহে বহুবিধ উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। অধিকন্তু, বিভিন্ন সামুদ্রিক এলাকা ভিত্তিক উৎপাদিত মৎস্য ও খাদ্যপণ্য চিহ্নিতকরণে আণবিক ও পারমাণবিক ভিত্তিক আইসোটপ সিগনেচার (Molecular and nuclear based isotope signature) প্রযুক্তিও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশ এবং অন্যান্য এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে কৃষি, মৎস্য চাষ, ঔষধ ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রথাগত ও আণবিক উভয় ধরণের বায়োটেকনোলজি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। টেরেস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি হতে শিক্ষা গ্রহণ করে তা সুনীল অর্থনীতি ধারণার আওতাধীন সুনীল বায়োটেকনোলজিতে প্রয়োগ ও ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুনীল বায়োটেকনোলজি খাতের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে এখনও পুরোপুরি করা হয়ে উঠেনি। সুনীল অর্থনীতির অন্যান্য খাতের তুলনায় এই খাতে অংশীজনের (stakeholders) অনাগ্রহের কারণে বিশ্বব্যাপী সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়। তবে নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার এক বিশাল ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। এ ধরণের উচ্চপ্রযুক্তি নির্ভর গবেষণার জন্য উন্নয়ন অংশীদার দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ প্রয়োজন। তাই সুনীল বায়োটেকনোলজি-এর টেকসই ব্যবস্থপনা নিশ্চিতকল্পে ভবিষ্যতে জাতীয় মেরিন বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউট (National Marine Biotechnology Institute) স্থাপন করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে সক্ষমতা অনুযায়ী বাংলাদেশে ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ বিষয়ে গবেষণা কার্য চালিয়ে যেতে পারে।

অফশোর নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Offshore Renewable Energy) ঃ

ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে অবশ্যই তার জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজন গ্রীণ এনার্জি বা পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ও প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন প্রযুক্তি। 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' নিশ্চিতকরণে দূষণমুক্ত পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তি আসে মূলতঃ হাইড্রো-পাওয়ার/জল বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বায়ুশক্তি থেকে। এছাড়াও, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ও সমুদ্রের ঢেউয়েরও অনুরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সাল থেকে নবায়নযোগ্য শক্তি হতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ১০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের খুব সামান্যই আসে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। একারণেই, বর্তমান সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তি বা জ্বালানির ব্যবহার ও এর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ২০০৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা কার্যকর করা হয়। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রোপাওয়ার, বায়ো ফুয়েল, জিওথার্মাল, সমুদ্র ও নদীর স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে শনাক্ত করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এবং বিনিয়োগকারীদেরকে সরকার বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা প্রদান করছে। কিছু সংখ্যক দেশি ও বিদেশি সংস্থাও বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে আর্থিক নির্দেশনা বা প্রণোদনা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিফিনান্সিং স্কীম এর আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং অন্যান্য সাশ্রয়ী জ্বালানি উদ্যোগ যেমন- বায়োগ্যাস, সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস প্লান্টস, সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থা এবং বায়ু টার্বাইনের জন্য কম সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া কিছু

নবায়নযোগ্য জ্বালানি পণ্য যেমন: সোলার প্যানেল, সোলার প্যানেল প্রস্তুতের উপাদান, চার্জ কন্ট্রোলার, ইনভার্টার, এলইডি লাইট, সৌরচালিত বাতি এবং বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর সরকার শুল্ক অব্যাহতিমূলক প্রণোদনা প্রদান করেছে। একইভাবে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ও ঢেউ নির্ভর নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য যথাযথ গুরুত্বারোপ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে।

সৌর শক্তি (Solar Energy)ঃ

ভৌগলিক এবং আবহাওয়া জনিত কারণে বাংলাদেশে সৌর শক্তি উৎপাদন এবং ব্যবহারের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিদিন গড়ে ৪.৫ কিলোওয়াট ঘন্টা/বর্গমিটার সৌর বিকিরণ লাভ করে। সম্প্রতি প্রকাশিত "রিনিউয়েবলস ২০২০ গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট (জিএসআর)" অনুযায়ী অফগ্রীড সৌর পদ্ধতি থেকে অতিরিক্ত ১১ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নেপালের অবস্থান প্রথম। বাংলাদেশ ও মঙ্গোলিয়া এই পদ্ধতিতে আট শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যানুযায়ী দেশের অফগ্রীড অঞ্চলে এ পর্যন্ত ৪.৫ মিলিয়নের অধিক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৬৫৩.২ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সৌর প্যানেল স্থাপন করে এ ধরণের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হলে সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

অফশোর বায়ুশক্তি (Offshore Wind Energy)ঃ

অফশোর বায়ুশক্তি হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাধিক আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী এবং উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা সৃষ্ট নবায়নযোগ্য জ্বালানি উপখাত যা দ্রুত বিশেষত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হতে মূলধারার বিদ্যুৎ যোগানদাতা হিসেবে পরিগণিত হতে চলেছে। বাংলাদেশে প্রথম ২০০৫ সালে বায়ুশক্তির উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে দুটি বায়ুশক্তি উৎপাদন প্রকল্প চালু রয়েছে। মুহুরি বাঁধ বায়ুশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যেটি প্রথম জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত বায়ুশক্তি উৎপাদন প্রকল্প এবং কুতুবদিয়া দ্বীপ প্রকল্প। মুহুরি বাঁধ প্রকল্পে ৪টি ২২৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন টারবাইন দিয়ে বছরে প্রায় ১ মেগাওয়াট এবং কুতুবদিয়া দ্বীপ প্রকল্প থেকে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দ্বীপাঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভাগের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে মার্চ-সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে বাতাসের গতিবেগ থাকে ঘন্টায় ৩ থেকে ৪ মিটার/সেকেন্ড এবং বছরের বাকি সময়ে থাকে ১.৭ থেকে ২.৩ মিটার/সেকেন্ড। বসন্তের শেষে বা মৌসুমী ঋতুগুলোতে (মার্চ থেকে অক্টোবর) নিম্নচাপ অঞ্চল থাকতে পারে বা ঝড়ো বাতাসের স্বাভাবিক গতি ১০০-২০০ কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে। দ্বীপাঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বায়ুমিল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পদক্ষেপ নেয়া আশু প্রয়োজন। পরবর্তীতে, এ সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বাস্তবায়নের জন্য বায়ুম্যাপিং (বায়ু প্রবাহের ধরণ, প্রকৃতি, বেগ ও সময়কাল)-এর ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আধুনিক বায়ুমিল স্থাপন করার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সমুদ্রের স্রোত ও ঢেউ হতে শক্তি (Tidal & Wave Energy)ঃ

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার ভাটার ধরণ মূলতঃ সেমিডিউরনাল (অর্থাৎ প্রতি ২৪ ঘন্টায় দুটি জোয়ার ও দুটি ভাটা সংঘটিত হয়ে থাকে), ঋতুভেদে যার সময়কাল পরিবর্তনশীল এবং সর্বোচ্চ জোয়ার সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী প্রবাহকালীন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই সময়ে জোয়ারের বিস্তৃতির গড় উচ্চতা থাকে ৪-৫ মিটার এবং জোয়ারের প্রস্রবনের (Spring Tide) সময় তা ৬ মিটার উচ্চতা ছাড়িয়ে যায়। বিভিন্ন প্রাথমিক গবেষণা থেকে এটা প্রতীয়মান যে, কক্সবাজার, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, বরগুনা, সুন্দরবন এবং অন্যান্য স্থানে এইরূপ নির্দিষ্ট স্থান আছে যেখানে পাম্পিং সুবিধাসহ স্থায়ী বেসিন নির্মাণ করা যেতে পারে যা জোয়ারভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক হতে পারে। বাংলাদেশে বিশেষতঃ মার্চ মাসের শেষভাগ থেকে অক্টোবর মাসের প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়ে সমুদ্রের ঢেউ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উপযোগী থাকে।

এ সময়ে সাধারণত ২ মিটারের বেশি এবং সর্বোচ্চ ২.৪ মিটার বিস্তৃত ঢেউয়ের উচ্চতা রেকর্ড করা হয়। ০.৫ মিটার ঢেউয়ের ব্যাপ্তি ৩ থেকে ৪ সেকেন্ড এবং ২ মিটার ঢেউয়ের ব্যাপ্তি ৬ সেকেন্ডের মত হয়ে থাকে। প্রাথমিক গবেষণায় দেখা যায় যে, সেন্টমার্টিন দ্বীপের নিকট সমুদ্রের ঢেউ থেকে শক্তি উৎপাদনের উৎস বিদ্যমান আছে। তবে বাংলাদেশের অফশোর এলাকা সমুদ্রের ঢেউ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সহায়ক কিনা এ বিষয়ে আরও গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলন	বাংলাদেশের জলসীমায় বিভিন্ন ব্লকে তেল-গ্যাসের বড় মজুদ পাওয়া যেতে পারে, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন জরিপে প্রমাণিত। এ সকল ব্লকে তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে তেল-গ্যাস উত্তোলনের ব্যবস্থা করলে তা দেশের জ্বালানি সমস্যা দূরীকরণে প্রভূত ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।	ভারত এবং মায়ানমার তেল গ্যাস উত্তোলনের জন্য জরিপ ও অনুসন্ধান কাজে অনেক অগ্রসর হলেও বাংলাদেশ এ ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। সাগরের নিচে ছোটখাটো তেল-গ্যাসের কাঠামো পাওয়া গেলেও সেখান থেকে যে উত্তোলনযোগ্য মজুদ পাওয়া যায়, তা অনেকক্ষেত্রেই বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক হয় না।	জরিপ কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে করে কূপ খননের প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স এবং পেট্রোবাংলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে অনুসন্ধান কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা যায়।	১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. পেট্রোবাংলা; ৩. বাপেক্স; ৪. ব্লু ইকোনমি সেল; ৫. জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	ভারত এবং মায়ানমার তাদের সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত অনেক তেল-গ্যাস কোম্পানি নিযুক্ত করছে। কিন্তু বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণের ৬ বছর পরেও অনুসন্ধান কাজে তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। তাই অনুসন্ধান কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিতে বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে কাজ করে তেল-গ্যাসের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া ভবিষ্যতে তেল গ্যাস অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের ব্যাপারে অফশোরে অনুসন্ধান ও উত্তোলনে সক্ষমতা অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
২	গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতির সম্ভাব্যতা যাচাই, উপস্থিতি নির্ণয় ও মজুদ পরিমাপ	বাংলাদেশের জলসীমায় সমুদ্রের তলদেশে এবং মহীসোপানের ঢালে বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি ও মজুদের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যা বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।	গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি যাচাই এর জন্য ইতোপূর্বে কোন রকম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি।	মহীসোপানে বাংলাদেশের দাবি পেশসংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রস্তুত করার নিমিত্ত ২০০৮ এবং ২০১০ সালে সম্পন্নকৃত সাইসমিক জরিপ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল জরিপসমূহের মাধ্যমে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকৃত জলসীমায় গ্যাস হাইড্রেট এর উপস্থিতি, অবস্থান, প্রকৃতি ও মজুদ নির্ণয় করার জন্য ডেস্কটপ স্টাডি চলমান রয়েছে। এ স্টাডি হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে গ্যাস হাইড্রেট উত্তোলনের মাধ্যমে জ্বালানি সংকট নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. পেট্রোবাংলা; ৩. বাপেক্স; ৪. ব্লু ইকোনমি সেল; ৫. জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ; ৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ০.৫৯ মিলিয়ন / ৫ কোটি টাকা (আনুমানিক)	গ্যাস হাইড্রেটের উপস্থিতি নির্ণয় ও মজুদ পরিমাপের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, ভারত, কোরিয়া সহ বিভিন্ন দেশ নানামুখী গবেষণা পরিচালনা করছে। এ সকল দেশ থেকে কারিগরি সহায়তা লাভ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপরোক্ত দেশসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।

৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৩	মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস এর উপস্থিতি নির্ণয় এবং পরবর্তীতে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য স্কোপিং স্টাডি পরিচালনা ও প্রাপ্ত ফলাফল বাণিজ্যিকী-করণের উদ্যোগ গ্রহণ	রাষ্ট্রীয় সমুদ্রাঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিতকরণ, জীব বৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস-এর উপস্থিতি নির্ণয় এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে তা সুনীল বায়োটেকনো-লজির নানাবিধ খাতে ভূমিকা রাখতে পারবে।	পর্যাপ্ত কারিগরি প্রযুক্তি এখনও অপ্রতুল অবস্থায় রয়েছে। অদ্যাবধি বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ হয়নি।	১. রাষ্ট্রীয় সমুদ্রাঞ্চলে অবস্থিত মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস এর উপস্থিতি খুঁজে বের করার লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের সহায়তায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্কোপিং স্টাডি চলমান রয়েছে। মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস এর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের পরে তা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও তথ্য কসমেটিক্স তৈরি এবং দেশীয় বায়োটেকনোলজির নানাবিধ খাতে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম চালাতে হবে। ২. প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ৩.ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি; ৪. বিভিন্ন এনজিওসমূহ ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান; ৫. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।	২০২০-২০২৫	মাঃ ডঃ ১.৫ মিলিয়ন /১৩ কোটি টাকা (আনুমানিক)	রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার বহির্ভূত সমুদ্রাঞ্চলের মেরিন জেনেটিক রিসোর্সেস হতে প্রাপ্ত অর্থের সুষম বন্টন এবং এ বিষয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের যথাযথ অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য বর্তমানে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক আইনি দলিল প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে তাতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত এতে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
৪	মেরিন ক্যাপচার (capture) ফিশারিজ ব্যবস্থাপনা	আণবিক/এসএনপি মার্কার ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রজাতির শ্রেণীবিন্যাসকরণ/ জিন ম্যাপিং (Gene Mapping), জিন পর্যায়ক্রমকরণ (Gene Sequencing), সুনির্দিষ্ট সামুদ্রিক মজুদ নির্ণয়ের অবকাঠামো নির্মাণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য, চিংড়ি ও কাঁকড়া আহরণ করে তাদের গুণগত মূল্যায়ন ও মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে পারলে সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধন হবে।	১.সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও উদ্যোগের অভাব; ২. পর্যাপ্ত কারিগরি ভাবে দক্ষ জনবল/ বিশেষজ্ঞের অভাব; ৩. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের অভাব।	বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার বিশাল একটি ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে।	১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ২. মৎস্য অধিদপ্তর; ৩.বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন; ৪.ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিকস্, মৎস্য অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; ৫.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ৬. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১২ মিলিয়ন / ১০০ কোটি টাকা (আনুমানিক)	বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। সুনীল বায়ো-টেকনোলজি হলো সুনীল অর্থনীতির অনেক উপ-খাতের উন্নয়নের একটি বিশাল ক্ষেত্র। তাই এ খাতে যথাযথ গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।

৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৫	মেরিকালচার উন্নয়ন	জেনেটিক্যালি তৈরি শস্যদানা, জলজ উদ্ভিজ তৈল এবং রঁজক মিশ্রিত মাছের খাদ্য ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় মাছের উন্নত জাতের খাদ্য ও বীজ প্রস্তুতকরণে এবং চিকিৎসা গুণসম্পন্ন দ্রব্যাদি তৈরিতে। মেরিকালচার পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করলে সুনীল অর্থনীতির উন্নয়ন সম্ভব।	১.সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও উদ্যোগের অভাব; ২. পর্যাপ্ত কারিগরি ভাবে দক্ষ জনবল/ বিশেষজ্ঞের অভাব; ৩. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের অভাব।	১. বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার বিশাল একটি ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। ২. বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন; ৩.ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিকস্, মৎস্য অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; ৪.সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১৫ মিলিয়ন / ১২৬ কোটি টাকা (আনুমানিক)	মেরিকালচার খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৬	সামুদ্রিক শৈবাল এবং অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্যাদির বাণিজ্যিক উৎপাদন	ম্যাক্রো ও মাইক্রো এ্যালগি (বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ) হতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন, সামুদ্রিক শৈবাল থেকে জৈব-জ্বালানি উৎপাদন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ হতে চিনি ও ফ্যাট; তৈল পুনরুদ্ধারক-ারী সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। সামুদ্রিক কিউকাম্বার ও সামুদ্রিক আর্চিন হতে রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ উৎপাদন করা যেতে পারে।	১.সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও উদ্যোগের অভাব; ২. পর্যাপ্ত কারিগরি ভাবে দক্ষ জনবল/ বিশেষজ্ঞের অভাব; ৩. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের অভাব।	১. বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার বিশাল একটি ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। ২. বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১.মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. বিএফআরআই এর মেরিন স্টেশন; ৩.ডিপার্টমেন্ট অব ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিকস্, মৎস্য অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; ৪. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১০ মিলিয়ন প্রায়/ ৮৫ কোটি প্রায়।	সামুদ্রিক কিউকাম্বার ও আর্চিন হতে রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ উৎপাদন করা সম্ভব হলে তা দেশের ঔষধ শিল্পের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৭	খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ	খাদ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রিবায়োটিকস্, ওমেগা-৩ সাপ্লিমেন্ট, খাদ্য জেলি, ফোমিং এজেন্ট ইত্যাদির জন্য সমুদ্রজাত খাদ্য সহায়ক হতে পারে।	১.সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও উদ্যোগের অভাব; ২. পর্যাপ্ত কারিগরি ভাবে দক্ষ জনবল/ বিশেষজ্ঞের অভাব; ৩. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের অভাব।	১. বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার বিশাল একটি ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। ২. বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১.ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনো-লজি; ২.বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট; ৩.বায়ো টেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ৫. সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যা-লয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১২ মিলিয়ন / ১০০ কোটি টাকা (আনুমানিক)	খাদ্য ও পুষ্টি ক্ষেত্রে এই সকল উদ্যোগ অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।
৮	সামুদ্রিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ	বিষাক্ত ও রঞ্জক, সাগর থেকে বিষাক্ত পদার্থ ও তেল ইত্যাদি অপসারণের জন্য দূষণ প্রতিষেধক (Biore-mediation), দূষণ মুক্তকরণ (De-pollu-tion), এন্টিফউলিং হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা টেকসই সামুদ্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।	১. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও উদ্যোগের অভাব; ২. পর্যাপ্ত কারিগরি ভাবে দক্ষ জনবল/ বিশেষজ্ঞের অভাব; ৩. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের অভাব।	১. বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার বিশাল একটি ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। ২. বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২. ব্লু-ইকোনমি সেল, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; ৩. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি; ৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১০ মিলিয়ন / ৮৫ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সামুদ্রিক টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত-করণে সুনীল বায়োটেকনোলজি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৯	সমুদ্র ভিত্তিক শিল্প স্থাপন	জৈব আঠা এবং জৈব-পরিশোধনকারী পণ্যাদি, মৎস্য/প্রাণির খাদ্য এবং বায়োডিজেল ইত্যাদি উৎপাদন করা যেতে পারে।	১.সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও উদ্যোগের অভাব; ২. পর্যাপ্ত কারিগরি ভাবে দক্ষ জনবল/ বিশেষজ্ঞের অভাব; ৩. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের অভাব।	১. বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার বিশাল একটি ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। ২. বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. শিল্প মন্ত্রণালয়; ২. বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট; ৩. বায়োটেকনো-লজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়; ৫. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১২ মিলিয়ন / ১০০ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সুনীল বায়োটেকনোলজির উন্নয়নে এই সকল খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
১০	সামুদ্রিক সম্পদ হতে কসমেটিক্স উৎপাদন	সামুদ্রিক শামুক, ঝিনুক ও পণ্যাদি এবং অন্যান্য কাঁচামাল ব্যবহার হতে Ultra Violet -ফিল্টার, সান বার্ণ প্রতিরোধক ও সামুদ্রিক মুক্তা হতে কসমেটিক্স তৈরি করা যেতে পারে।	১.সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও উদ্যোগের অভাব; ২. পর্যাপ্ত কারিগরি ভাবে দক্ষ জনবল/ বিশেষজ্ঞের অভাব; ৩. সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনীল বায়োটেকনোলজি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের অভাব।	১. বাংলাদেশের জন্য এটি গবেষণার বিশাল একটি ক্ষেত্র; তাই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে হবে। ২. বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. শিল্প মন্ত্রণালয়; ২. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব বায়োটেকনোলজি; ৩. বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট; ৪.বায়ো টেকনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ৫.অন্যান্য বিশ্ববিদ্যা-লয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ২০ মিলিয়ন / ১৭০ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সুনীল বায়োটেকনোলজির উন্নয়নে এই সকল খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১১	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ও দ্বীপাঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ও দ্বীপাঞ্চলে সৌর প্যানেলের পাশাপাশি ভাসমান সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	এখনও পর্যন্ত মূলতঃ গ্রীড বহির্ভূত অঞ্চলেই সৌর শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে।	১.বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় এবং দ্বীপাঞ্চলে কার্যকরভাবে আধুনিক সৌর প্যানেল এবং ভাসমান প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা করতে পারে। ২.ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; ২. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ; ৩.সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপকূলীয় ও দ্বীপাঞ্চলে ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে তা নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।
১২	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জোয়ার ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন	কক্সবাজার, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, বরগুনা, সুন্দরবন এবং অন্যান্য উপকূলীয় স্থানে পাম্পিং সুবিধাসহ স্থায়ী বেসিন নির্মাণ ও জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব বিদ্যমান।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দেশি এবং বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।	১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ৩.বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর; ৪.পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৫. ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং; ৬.সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	স্রোত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে শীর্ষ পাঁচ দেশ হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও বেলজিয়াম। উপরোক্ত দেশসমূহের নিকট হতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।

৫.২ অফশোর জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সুনীল বায়োটেকনোলজি (Offshore Energy, Renewable Energy & Blue Biotechnologies) গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১৩	সমুদ্রের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন	উপকূলীয় এবং অফশোর এলাকায় সমুদ্রের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব বিদ্যমান।	সমুদ্রের ঢেউকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দেশি এবং বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।	১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ৩.বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর; ৪.পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৫.ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং; ৬. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যা-লয়সমূহ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম দেশসমূহের নিকট হতে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।
১৪	যথাযথভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ুম্যাপিং ও আধুনিক বায়ুমিল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা শুধুমাত্র কুতুবদিয়ায় বায়ুমিল স্থাপনের মাধ্যমে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নগণ্য। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপকূলীয় এলাকার বায়ুম্যাপিং (বায়ু প্রবাহের ধরণ, প্রকৃতি, বেগ ও সময়কাল) ও কালীন সারি (Time Series) উপাত্ত সংগ্রহ এবং উক্ত উপাত্ত নির্ভর বাংলাদেশের উপকূল উপযোগী আধুনিক বায়ুমিল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	অপর্যাপ্ত বায়ুম্যাপিং ডাটা এবং বায়ুমিল স্থাপনের জন্য উপকূলীয় এলাকায় উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও বাংলাদেশে বায়ুমিল স্থাপনের উপযোগিতার বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব রয়েছে।	বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কার্যকরভাবে আধুনিক বায়ুমিল স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের সাথে আলোচনা করতে পারে।	১.বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; ২.বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর; ৩.পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৪. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ; ৫.সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	আধুনিক বায়ুমিল স্থাপনের জন্য যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও চীন সহ বিভিন্ন দেশ নানামুখী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বায়ুম্যাপিং ও আধুনিক বায়ুমিল স্থাপনের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে এ সকল দেশের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপরোক্ত দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।

৬. স্থিতিশীল জীবিকার জন্য ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগত সেবাসমূহ (Ecosystem Services of Mangroves) নিশ্চিতকরণ

৬.১ প্রেক্ষাপট

ম্যানগ্রোভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুসংস্থান যা উপকূলীয় সম্প্রদায়কে অনেক বাস্তুসংস্থানগত সেবা প্রদান করে থাকে বাস্তুসংস্থান-গত সেবা (Ecosystem Service) বলতে মানব কল্যাণে বাস্তুসংস্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানকে বুঝায়। কিন্তু বেশীর-ভাগ সেবাই বাস্তবিক অর্থে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কাঠ, বনজ পণ্য, মৎস্য আহরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়; কিন্তু কার্বন স্টোরেজ, পানির মান, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যা ম্যানগ্রোভ বাস্তুসংস্থানগত সেবা প্রদান করে থাকে, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা বা পরিমাপ করা অত্যন্ত দুরূহ। তবে এই সকল সেবা বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য, যা সুনীল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের ভৌগলিক প্রকৃতি (Topography) মূলত সমতলীয়। এই ব-দ্বীপে নিকট অতীতে ভূমির ব্যবহারে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যার মধ্যে রয়েছে ৬০-৭০ এর দশকে পোল্ডারস (Polders) নির্মাণ এবং ৮০ এর দশকে রপ্তানিমুখী চিংড়ি চাষ এর উদ্ভব।

জোয়ারের পানি ও লবণাক্ততা হতে উপকূলীয় ভূমি রক্ষার মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মূলত পোল্ডারস (Polders) নির্মাণ করা হয়েছিলো। পাশাপাশি, ঘুর্ণিঝড়ের ছোবল হতে উপকূলীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করতেও পোল্ডারস ভূমিকা রাখত। কিন্তু পোল্ডারস নির্মাণ প্রাকৃতিক হাইড্রোডাইনামিক (Hydrodynamic) ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিচ্ছিল যার ফলশ্রুতিতে নদীর তলানিতে দ্রুত পলি জমতে শুরু করে, যা ধানের উৎপাদনকে ব্যাহত করেছিল। সেই সময় সী-ফুডের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া এবং সরকারের ইতিবাচক নীতি পরিবর্তনের কারণে কৃষকেরা অধিক লাভজনক চিংড়ি চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। যদিও চিংড়ি চাষের কারণে প্রায়শঃ ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস করা হয়ে থাকে; কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চকোরিয়া সুন্দরবন ব্যতীত কোন ম্যানগ্রোভ বন চিংড়ি চাষের জন্য উজাড় করা হয়নি। ধান চাষ করার উদ্দেশ্যে অধিকৃত ম্যানগ্রোভ বনের পরিত্যক্ত এবং জলাবদ্ধ অংশে মূলত চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছিল। তথাপি বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নতুন অর্জিত সমুদ্রাঞ্চল বাংলাদেশের জন্য যে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে তা কাজে লাগাতে বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে দেশের উপকূল এবং সমুদ্রাঞ্চলের বিশেষ করে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তুসংস্থানগত সেবা মূল্যায়নকে প্রাধিকার দিতে হবে। বাস্তুসংস্থানগত সেবা মূল্যায়নে বাংলাদেশ অন্যান্য উপকূলীয় দেশসমূহ হতে পিছিয়ে রয়েছে। তদুপরি, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ বিশেষজ্ঞের নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশ তা বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৬.২ ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগত সেবা (Ecosystem Services of Mangroves) নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থানগত সেবার (Ecosystem Service) মূল্যায়ন	ম্যানগ্রোভ বন টেকসই কাঠ, মৎস্য এবং অন্যান্য অ্যাকুয়াকালচার পণ্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টির উৎস এবং ইকোট্যুরিজম স্থাপনের মত বহুমুখী সুবিধা প্রদান করে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, যেখানে ম্যানগ্রোভ ভিত্তিক বাস্তুসংস্থানগত সেবা কার্যকর রয়েছে সেখানে মৎস্য উৎপাদনের হার অনেক বেশী।	বাস্তুসংস্থানগত সেবার মূল্যায়ন একটি জটিল ও ব্যয়বহুল উদ্যোগ। তাই, নীতি নির্ধারক ও দাতাগোষ্ঠী এ ধরণের গবেষণামূলক প্রকল্পে অর্থায়ন করতে অনীহা পোষণ করে। তাছাড়া, এ ধরণের কাজে আন্তর্জাতিক মানের সমন্বিত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে যা একক প্রচেষ্টায় বাস্তবায়ন করা দুরূহ।	দেশি ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় হতে দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গবেষণা কর্মসূচি আয়োজনের জন্য সীড ফান্ড (Seed fund) এর ব্যবস্থা এবং ম্যানগ্রোভ বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বৃহৎ প্রকল্পের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।	১.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২.সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ; ৩.বন অধিদপ্তর; ৪. সরকারি / বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান।	২০২০-২০২৫	মাঃ ডঃ ৫ মিলিয়ন /৪২ কোটি টাকা (আনুমানিক)	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ যৌথভাবে গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে পারে।
২	সুন্দরবন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত-করণ	সুন্দরবনের সম্পদের উপর সংলগ্ন এলাকার জনগণের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে বিধায় তাদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে তাদেরকে সম্পদ সংরক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করালে সম্পদ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া টেকসই হবে।	সম্পদ উজাড় না করে টেকসইভাবে মানসম্মত উপায়ে কিভাবে ম্যানগ্রোভ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করা যায়, সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করানোই প্রধান সমস্যা। জনগণকে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যে সম্পৃক্তকরণের যথাযথ নীতির অভাব রয়েছে। তথাপি, সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল প্রকল্পই top-down প্রক্রিয়া যেখানে জনগণের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি।	১.সম্পদের ভিত্তি (Resource base) এবং জনগণ কর্তৃক সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়ার ধরণ চিহ্নিতকরণ; ২.বিস্তারিত কমিউনিটি ম্যাপ; (Community Map) প্রস্তুতকরণ; ৩.বিস্তারিত ভেল্যু চেইন ম্যাপ (Value Chain Map) প্রস্তুতকরণ; ৪.উপকারি কর্মকান্ডগুলোকে পাইলট প্রকল্প (Pilot project) চালুকরণের মাধ্যমে সবার কাছে তুলে ধরা।	১.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২.বন অধিদপ্তর; ৩.মৎস্য অধিদপ্তর; ৪. সরকারি / বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ যৌথভাবে গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে পারে।

৬.২ ম্যানগ্রোভের বাস্তুসংস্থানগত সেবা (Ecosystem Services of Mangroves) নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৩	ম্যানগ্রোভ ভিত্তিক বাস্তুসংস্থানগত সেবা (Ecosystem Service) পুনরুদ্ধারে সিলভো অ্যাকুয়াকালচার (Silvo Aquaculture) উন্নয়ন	বর্তমান মনোকালচার (Monoculture) ভিত্তিক চিংড়ি চাষ পদ্ধতিতে উন্নয়ন অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। ভূমির অবনমন প্রক্রিয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিদ্যমান ভংগুর বাস্তুসংস্থানের জন্য হুমকি স্বরূপ। উপকূলীয় পোল্ডারস (polders) অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে এবং এই ধরণের ভূমি ব্যবহারও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি হতে মুক্ত নয়। বিদ্যমান ম্যানগ্রোভ বনভূমি ব্যবহারের ধরণে সমন্বয় সাধন করা গেলে শুধুমাত্র চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তা নয়, বরং চিংড়ি খামারগুলো পলি ব্যবস্থাপনা ও বাস্তুসংস্থানগত সেবা (Ecosystem Service) পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উপকূলীয় মানুষের জীবিকার ধরনে স্থিতিশীলতা আসবে বলে ধারণা করা হয়।	ভূমি হ্রাস, পলি ব্যবস্থাপনা, লবণাক্ততা পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও রোগ বৃদ্ধি বর্তমানে মনোকালচার ভিত্তিক চিংড়ি চাষকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।	১. উপকূলীয় চাষীদের সম্পৃক্ত করে সবচেয়ে কার্যকরী প্রাকৃতিক ভূমিব্যবস্থার পরিকল্পনা চিহ্নিতকরণের জন্য গবেষণা পরিচালনা; ২. উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ ভিত্তিক সিলভো অ্যাকুয়াকালচার উন্নয়নের জন্য রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানসহ প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন; ৩.পলি ব্যবস্থাপনা সমস্যা মোকাবিলার জন্য খাল ও নদী খনন কার্যে সরকারি অর্থায়ন; ৪.সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ নার্সারি প্রতিষ্ঠা এবং বৃক্ষ রোপনকারী কৃষকদের প্রণোদনা প্রদান।	১.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২.মৎস্য অধিদপ্তর; ৩.পানি উন্নয়ন বোর্ড; ৪.বন অধিদপ্তর; ৫. বিএফআরআই।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএফআরআই এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারে। পুনর্গঠিত ও পরিবর্তিত প্রাকৃতিক ভূমিব্যবস্থার মাধ্যমে ম্যানগ্রোভকে চিংড়ি চাষের সাথে সমন্বয় করতে পারলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে।
৪	ব্লু-কার্বন (Blue Carbon) ট্রেডিং	বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ জগতের কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন এর হার (Carbon sequestration Rate) স্বাভাবিকের চাইতে ১০ গুণ বেশি। কার্বন ট্রেডিং (Carbon Trading) মূলত বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে যা বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।	কার্বন ট্রেডিং এর গুরুত্ব উপলব্ধি এবং এর উন্নয়নে গবেষণা ও নীতি প্রণয়নের উদ্যোগের অভাব।	১. সুন্দরবনের কার্বন মজুদ মূল্যায়ন; ২. কার্বন ফাইন্যান্স মেকানিজম (Carbon Finance Mechanism) তালিকাভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ; ৩. কার্বন ট্রেডিং এর জন্য সামাজিক বনায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study)।	১.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২.বন বিভাগ; ৩.পরিবেশ অধিদপ্তর।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন-মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যৌথভাবে গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে পারে।

৭. জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প (Ship Building and Recycling Industry) সম্প্রসারণ

৭.১ প্রেক্ষাপট

জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি অপার সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, যা সুনীল অর্থনীতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই শিল্প জাহাজ ছাড়া অন্যান্য মেরিন সরঞ্জামাদি নির্মাণের সাথেও সম্পৃক্ত। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের আন্তর্জাতিক বাজার এবং চাহিদা বিবেচনায় বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে যে সমস্ত শিপইয়ার্ড (Shipyard) ও ওয়ার্কশপ (Workshop) রয়েছে, তা অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচল উপযোগী জাহাজ (Inland vessels), দ্রুতগামী প্যাট্রোলযান (Fast patrol boats), ড্রেজিং জাহাজ (Dredging barges), যাত্রীবাহী জাহাজ (Passenger vessels), ল্যান্ডিংক্রাফট (Landing craft), টাগবোট (Tugboat), সরবরাহকারী জাহাজ (Supply barges), ডেকলোডিং জাহাজ (Deck loading barges), স্পীডবোট (Speedboat), কার্গো কোস্টার (Cargo coasters), ট্রুপ বহনকারী জাহাজ (Troop carrying vessels), হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ (Hydrographic survey vessels), জরিপ বোট (Survey boat), পাইলট বোট (Pilot boats), ওয়াটার ট্যাক্সি (Water taxi) এবং খেয়ানৌকা (Pontoons) নির্মাণ চাহিদার প্রায় সবটুকুই পূরণ করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ডসমূহ থেকে ১০,০০০ DWT (Deadweight Tonnage) সমুদ্রগামী জাহাজ রপ্তানি করা হয়, যা অদূর ভবিষ্যতে ২৫,০০০ DWT (Deadweight Tonnage) পর্যন্ত উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সড়ক ও পরিবহন খাতের জন্য যানবাহনের প্রায় পুরোটাই বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। এ কারণে সরকারকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে, রপ্তানিমুখী হওয়ায় এবং আমদানি নির্ভর না হওয়ায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা পালন করে তা নয়, বরং তা সাশ্রয়েও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। এছাড়া এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল নির্মাণ এবং প্রকৌশল শিল্প রয়েছে, যেমন জাহাজ মেরামত ও এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য শিল্প, সেগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে এ শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

২০১৯ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৬.৭ মিলিয়ন টন জাহাজ ভাঙা হয়েছিলো যা কিনা পৃথিবীর মোট জাহাজ রিসাইক্লিংয়ের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ এবং জাহাজের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ। জাহাজ ভাঙা শিল্প থেকে ৭০-৭৫ শতাংশ স্ক্র্যাপ স্টিল (Scrap steel) পাওয়া যায় যা স্টিল এবং রি-রোলিং মিলস (Re-rolling mills) এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে ১২৫ টিরও অধিক জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতি বৎসর প্রায় ২.৫ বিলিয়ন ডলার আয় হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণপূর্বক জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্পকে একটি আধুনিক শিল্পে পরিণত করতে পারলে তা বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির ধারণা বাস্তবায়নে প্রভূত ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সমুদ্রকে কেন্দ্র করে নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে এই ধরণের ব্যবসাসমূহকে বহুমুখী করা এখন সময়ের দাবি। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালুকৃত সমুদ্রবিদ্যা বিভাগসমূহ আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে এবং বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে যাতে করে দক্ষ নাবিক, প্রকৌশলী, পাইলটসহ জাহাজ শিল্প সংশ্লিষ্ট দক্ষ পেশাজীবী ও শ্রমিক গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রকৌশলী, যন্ত্রপাতি সরবরাহকারি, জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণ বিশেষজ্ঞ, সমুদ্রনীতি বিশেষজ্ঞ, সমুদ্র আইন বিশেষজ্ঞসহ নানাবিধ পেশাজীবী তৈরিপূর্বক এই শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ করে সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধন করতে হবে।

৭.২ জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প (Ship Building and Recycling Industry) সম্প্রসারণের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	জাহাজ নির্মাণ	ক্রমবর্ধমান বাজার ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে ছোট ও মাঝারি জাহাজের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে বড় জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ এবং সাবমেরিন নির্মাণ করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এই শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনাকে কাজে লাগালে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব।	প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এবং অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	১. ট্যাক্স হলিডে/ প্রণোদনা চালু করা; ২. শিল্পের বিকাশ এবং মানোন্নয়নে সীড ফান্ডের (Seed Fund) ব্যবস্থাকরণ; ৩. বেসরকারি অংশগ্রহণ আহ্বান এবং উৎসাহিতকরণ।	১. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ২. নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর; ৩.বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ৪.শিল্প মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	নতুন বাজার খোঁজার পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে।
২	পরিবেশবান্ধব জাহাজ রিসাইক্লিং নিশ্চিতকরণ	আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন পরিবেশবান্ধব জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানিমুখী বাজার সৃষ্টি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া এ শিল্পের নেতিবাচক দিকগুলোও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য শিল্পের বিকাশ সাধনও করা সম্ভব।	পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ে উঠেনি এবং অপর্যাপ্ত তদারকি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।	১.বরগুনার তালতলীতে প্রস্তাবিত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন জাহাজ রিসাইক্লিং জোন স্থাপনের প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন; ২.পরিবেশবান্ধব জাহাজ রিসাইক্লিং এর জন্য প্রণোদনা চালু করা; ৩.নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা; ৪.পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো গড়ে উঠছে কিনা তার জন্য যথাযথ মনিটরিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।	১.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২.নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; ৩.নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর; ৪.বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ৫.শিল্প মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	পরিবেশবান্ধব জাহাজ রিসাইক্লিং নিশ্চিতকরণে উন্নত ও সক্ষম রাষ্ট্রসমূহের নিকট হতে অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা করা নেয়া যেতে পারে।

৮. সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

৮.১ প্রেক্ষাপট

প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য একই সাথে বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক পরিবেশ ও সম্পদ বিনষ্ট করছে এবং উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে পর্যটন খাতের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এছাড়াও ডাইং, চামড়া, রঞ্জক, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের দূষিত বর্জ্য দ্বারাও সমুদ্র দূষণ হয়ে থাকে। এই জাতীয় দূষণ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ সহ সকল সামুদ্রিক সম্পদ টেকসইভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। পর্যটন খাতও ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হবে। সর্বোপরি, সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা গেলে তা সামগ্রিকভাবে সুনীল অর্থনীতির বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক ও মৎস্যশিল্প জাত বর্জ্য হ্রাসকরণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য সুনির্দিষ্ট সংস্থা না থাকা এবং জলাশয়ে, নদীতে বা সমুদ্রে প্লাস্টিক নিক্ষেপের জন্য দায়ী ভোক্তা ও শিল্প-কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োগ না থাকা। এই সকল প্রতিবন্ধকতা হ্রাসকরণের অংশ হিসেবে সরকার সিঙ্গেল-ইউজ (Single-use) প্লাস্টিক সামগ্রীর উপর করারোপ করতে পারে। প্লাস্টিক বর্জ্য রোধে অধিকতর পরিবেশবান্ধব ফিশিং উপকরণ ক্রয়ের জন্য আর্থিক প্রণোদনা চালু করা যেতে পারে। এছাড়া, প্রণোদনা হিসেবে ডিপোজিট-রিফান্ড সিস্টেম চালু করা যেতে পারে। জেলে ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক ডাম্পিং হ্রাস করা যেতে পারে। এছাড়া, জাহাজ কর্তৃক সমুদ্রে দূষণের ব্যাপারে যথাযথ তদারকি এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থলভাগের স্থাপনা যাতে পানি এবং সমুদ্র দূষণের কারণ না হয় সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তৎপর হতে হবে।

স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (Sewage treatment plants) দ্বারা মাইক্রোপ্লাস্টিক (Microplastic)/মাইক্রোবীড (Microbead) অপসারণ করা যায় না এবং তাই এ সকল উপাদান সমুদ্রের পানিতে মিশে যাওয়া থেকে প্রতিহত করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। এ কারণে ভোগ্যপণ্যে মাইক্রোবীড (Microbead) ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। যেহেতু মাইক্রোবীডের (Microbead) প্রাকৃতিক বিকল্প ইতোমধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, সেহেতু ভোগ্যপণ্যে এর ব্যবহার বন্ধ করে নতুন বিকল্প চালুকরণে খুব একটা সমস্যা হবে না। ভোক্তা সচেতনতার অভাব ও ভোক্তা কর্তৃক মাইক্রোপ্লাস্টিক সংবলিত পণ্যের ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য পরিশোধ করার কোন ব্যবস্থা না থাকা বঙ্গোপসাগরে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ কমানোর পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকার ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করে ভোগ্যপণ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ কমাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

বঙ্গোপসাগরের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য প্রধান নদীকূলের প্রবাহের উপর গবেষণা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীকূলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে পলি, পুষ্টি উপাদান, দূষণের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারলে তা নীতি নির্ধারকদের ভবিষ্যতে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। তবে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রধান নদীকূলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণের উপরে উল্লেখযোগ্য কোন বেজলাইন স্টাডি হয়নি। যার ফলে এই ধরণের প্রবাহ পর্যবেক্ষণের উপরে উল্লেখযোগ্য একটি বেজলাইন স্টাডি চালু করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই স্টাডি পলি, পুষ্টি উপাদান, দূষণ প্রবণতা বুঝতে এবং ভবিষ্যতে সমুদ্র উপকূলে মেরিকালচারের সম্ভাবনা নির্ণয়ে সাহায্য করবে। জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প কারখানা সাধারণত সমুদ্র উপকূলে গড়ে উঠে। এ সকল কারখানা হতে প্রতিনিয়ত নির্গত হয় নানা ধরণের ভারী মেটাল যা সমুদ্রে পর্যবসিত হয়ে থাকে। এছাড়াও সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণ ও মাইক্রোপ্লাস্টিকের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে সামুদ্রিক মৎস্য ও পরবর্তীতে মানব শরীরে প্রবেশের আশংকা সৃষ্টি করছে। কিন্তু উপকূলীয় এলাকায় মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ভারী মেটালের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য অদ্যাবধি উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। যদি উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ভারী মেটালের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তবে তা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। এভাবে এসকল প্রকল্প গ্রহণ ও সম্পাদনের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করা গেলে তা ভবিষ্যতে সামগ্রিকভাবে সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৮.২ সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	প্লাস্টিক ও মৎস্যশিল্প জাত বর্জ্য হ্রাসকরণ	প্লাস্টিক দ্রব্য এবং ডাইং, চামড়া, রঞ্জক, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের দূষিত বর্জ্য দ্বারা সৃষ্ট সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা গেলে তা সামুদ্রিক সম্পদ ও মৎস্য সংরক্ষণের পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতির বিকাশেও ভূমিকা রাখবে।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ, এনজিও এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়; জলাশয়ে, নদীতে বা সমুদ্রে প্লাস্টিক নিক্ষেপের জন্য দায়ী ভোক্তা ও শিল্প-কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োগ না থাকা বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক ও মৎস্যশিল্প জাত বর্জ্য হ্রাসকরণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।	১. সিঙ্গেল-ইউজ (single-use) প্লাস্টিক সামগ্রীর উপর করারোপ; ২. প্লাস্টিক বর্জ্য রোধে অধিকতর পরিবেশবান্ধব ফিশিং উপকরণ ক্রয়ের জন্য আর্থিক প্রণোদনা এবং/অথবা কোন ধরণের ডিপোজিট-রিফান্ড সিস্টেম চালু করা; ৩. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা-সমূহকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা।	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২. শিল্প মন্ত্রণালয়; ৩.বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	২০২০-২০২৫	মাঃ ডঃ ২০০ মিলিয়ন/ ১৬৮২ কোটি টাকা (আনুমানিক)	ভোগ্যপণ্যের মূল্য নির্ধারণে ঐ পণ্যের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব আমলে নিতে হবে।
২	ভোগ্যপণ্য হতে মাইক্রোপ্লাস্টিক হ্রাসকরণ	ভোগ্যপণ্যে মাইক্রোবীড (Microbead) ব্যবহার নিষিদ্ধ করলে সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।	১. ভোক্তা সচেতনতার অভাব; ২. মাইক্রোপ্লাস্টিক জাতীয় পণ্য ব্যবহারের দরুন পরিবেশের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন মূল্য ঐ পণ্যের মূল্যের সাথে সংযোজিত না হওয়া।	১. ভোগ্য পণ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; ২. মাইক্রোপ্লাস্টিক সংবলিত পণ্যের ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য পরিশোধ করার ব্যবস্থা চালু করা; ৩. কর্তৃপক্ষ, উদ্যোক্তা এবং ভোক্তা সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২. শিল্প মন্ত্রণালয়; ৩. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০২৩	মাঃ ডঃ ৪০ মিলিয়ন/ ৩৩৫ কোটি টাকা (আনুমানিক)	আইন প্রয়োগের পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮.২ সামুদ্রিক দূষণ (Marine Pollution) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৩	পলি, পুষ্টি উপাদান, দূষণের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রধান নদীকূলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করা	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র- মেঘনা নদীকূলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে পলি, পুষ্টি উপাদান, দূষণ এর পরিমাণ নির্ণয় করতে পারলে তা নীতি নির্ধারকদের ভবিষ্যতে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তাজনিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।	প্রধান নদীকূলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে পলি, পুষ্টি উপাদান, দূষণের পরিমাণ নির্ণয় করার উল্লেখযোগ্য কোন বেজলাইন স্টাডি হয়নি।	গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র- মেঘনা নদীকূলের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে পলি, পুষ্টি উপাদান, দূষণের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য কার্যকরী বেজলাইন স্টাডি চালু করতে হবে। এই স্টাডি পলি, পুষ্টি উপাদান, দূষণ প্রবণতা বুঝতে এবং ভবিষ্যতে সমুদ্র উপকূলে মেরিকালচারের সম্ভাবনা নির্ণয়ে সাহায্য করবে।	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২. শিল্প মন্ত্রণালয়; ৩.সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমুহ; ৪.পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	মাঃ ডঃ ১০ মিলিয়ন/ ৮৫ কোটি টাকা (আনুমানিক)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমুহকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।
৪	সমুদ্রে মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ভারী মেটালের উপস্থিতি নির্ণয়	জাহাজ নির্মাণ ও রিসাইক্লিং শিল্প কারখানা হতে নির্গত ভারী মেটাল এবং সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণ ও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হলে তা এই সকল দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।	বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ভারী মেটালের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম চালু নেই।	বাংলাদেশে উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ভারী মেটালের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ২. শিল্প মন্ত্রণালয়; ৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ৪. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যা-লয়সমুহ।	২০২০-২০২৫	মাঃ ডঃ ০১ মিলিয়ন/৯ কোটি টাকা (আনুমানিক)	নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সমুদ্রে মাইক্রোপ্লাস্টিক ও ভারী মেটালের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ।

৯. মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning) বাস্তবায়ন

৯.১ প্রেক্ষাপট

সুনীল অর্থনীতি টেকসই সমুদ্র শাসনের (Ocean Governance) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; কেননা, সুনীল অর্থনীতি বলতে সুষম সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে বুঝায়। টেকসই সমুদ্র শাসন অর্জন করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত সুনীল অর্থনীতি এবং বাস্তুসংস্থান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার (Ecosystem Based Management) মত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণার বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই সমুদ্র শাসন বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে সুনীল অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning-MSP) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। টেকসই সমুদ্র শাসনের জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ এখনও প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে।

যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমুদ্রের বিভিন্ন অংশকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning)-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সমন্বিত ও টেকসই উপায়ে কার্যকরভাবে সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীজুড়ে সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান টেকসই করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর Marine Spatial Planning বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করে। তাই বাংলাদেশের সামুদ্রিক ও উপকূলীয় অঞ্চলে এটি প্রণয়ন করা হলে তা সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদ টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন অর্থনৈতিক খাত সৃষ্টিতে অবদান রাখবে।

এছাড়াও, আন্তঃদেশীয় বৃহত্তর সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের (Large Marine Ecosystem) মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং আঞ্চলিক ও বহুরাষ্ট্রীয় সমুদ্র ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আঞ্চলিক সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থানের কার্যকর সুরক্ষায় অবদান রাখে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং চালুকরণ ও বাস্তবায়ন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ এর অভীষ্ট ১৪ (টেকসই সমুদ্র শাসন সম্পর্কিত) এবং সুনীল অর্থনীতির লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং বাস্তবায়নের পথে চিহ্নিত প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ হলো: ১. বিদ্যমান খাতভিত্তিক জাতীয় নীতিমালাসমূহ সুনীল অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়; ২. সমন্বিত/সামগ্রিক উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (Integrated Coastal Zone Management-ICZM) এবং মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং এর বিদ্যমান আইনী অবকাঠামো পর্যাপ্ত ও সার্বজনীন নয়; ৩. বাংলাদেশের বিদ্যমান খাতওয়ারী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা টেকসই সমুদ্র শাসন এবং সুনীল অর্থনীতি কর্মকান্ডের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য অপর্যাপ্ত।

নতুন ভূমি সম্প্রসারণের নানাবিধ উপায় ও কৌশল রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল প্রকৌশল বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে চর ও দ্বীপ নির্মাণ। দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, ফলে চাহিদা বাড়ছে আবাসনের। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা। প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশে আবাসন, শিল্প-কারখানা, অবকাঠামো নির্মাণ এ সব কিছুর জন্যই প্রয়োজন নতুন জমির। আর এ কারণেই নেয়া হচ্ছে ভূমি সম্প্রসারণ প্রকল্প। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে এবং পরিবেশের উপর প্রভাব বিবেচনায় নিতে হবে।

৯.২ মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning) বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
১	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মেরিন স্পেশিয়াল পরিকল্পনা (Marine Spatial Planning) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	এসডিজি এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং বাস্তবায়নে সাহায্য করবে। বিশ্বব্যাংক এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তা নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া যাবে।	সচেতনতার অভাব, সমন্বয়হীনতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অসম্পূর্ণ আইন ও নীতিমালা বিদ্যমান।	১. MSP-এর জন্য একটি সামগ্রিক জাতীয় সমুদ্রনীতি প্রণয়ন; ২. MSP-এর জন্য একই প্রকৃতির ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন; ৩. MSP এবং ICZM এর জন্য সমন্বিত ও সহযোগিতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ; ৪. ব্লু-ইকোনমি সেলকে কার্যকর করা।	১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; ২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৩. নৌপরিহন মন্ত্রণালয়; ৪. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; ৪. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ৫. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; ৬. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ; ৭.ব্লু ইকোনমি সেল।	২০২০-২০২৫	মাঃ ডঃ ৫ মিলিয়ন/ ৪২ কোটি টাকা (আনুমানিক)	দেশীয় পর্যায়ে যেসব প্রতিষ্ঠান MSP বাস্তবায়ন করবে তাদের সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের MSP বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেইসব দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করতে পারে।
২	সামুদ্রিক পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা/ পাঠ্যক্রম চালুকরণ	Convention on Biological Diversity (CBD), The Intergovernmental Science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) এবং Climate Change সংক্রান্ত সকল নিয়মাবলী মেনে পরিকল্পনা প্রণয়ন হলে তা টেকসই হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরিবেশবিদ্যা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি-করণ এবং তদসংক্রান্ত গবেষণা সক্ষমতা উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	সচেতনতার অভাব, সমন্বয়হীনতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অসম্পূর্ণ নীতিমালা বিদ্যমান।	১. একটি যুগোপযোগী এবং আধুনিক সুনীল অর্থনীতি পাঠ্যক্রম উন্নয়ন যা MSP এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই সামুদ্রিক পরিবেশ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে। ২. এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন।	১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ২. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকরণে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

৯.২ মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিং (Marine Spatial Planning) বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা

প্রাধিকার	উদ্যোগ	বিস্তারিত বিবরণ	সীমাবদ্ধতা	গৃহিতব্য পদক্ষেপ	দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা/ মেয়াদ	প্রাক্কলিত বাজেট	অন্যান্য সুপারিশ
৩	ভূমি সম্প্রসারণ	প্রকৌশল বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে উপকূলীয় চর ও দ্বীপ নির্মাণ ও উপকূলীয় অঞ্চল যেমন নোয়াখালিতে Crossdam নির্মাণ যা মেরিন স্পেশিয়াল প্ল্যানিংয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।	প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।	১. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ; ২.এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ।	১.ভূমি মন্ত্রণালয়; ২.পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।	২০২০-২০৩০	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	ভূমি সম্প্রসারণ বিষয়ে উন্নত ও সক্ষম রাষ্ট্রসমূহের নিকট হতে অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

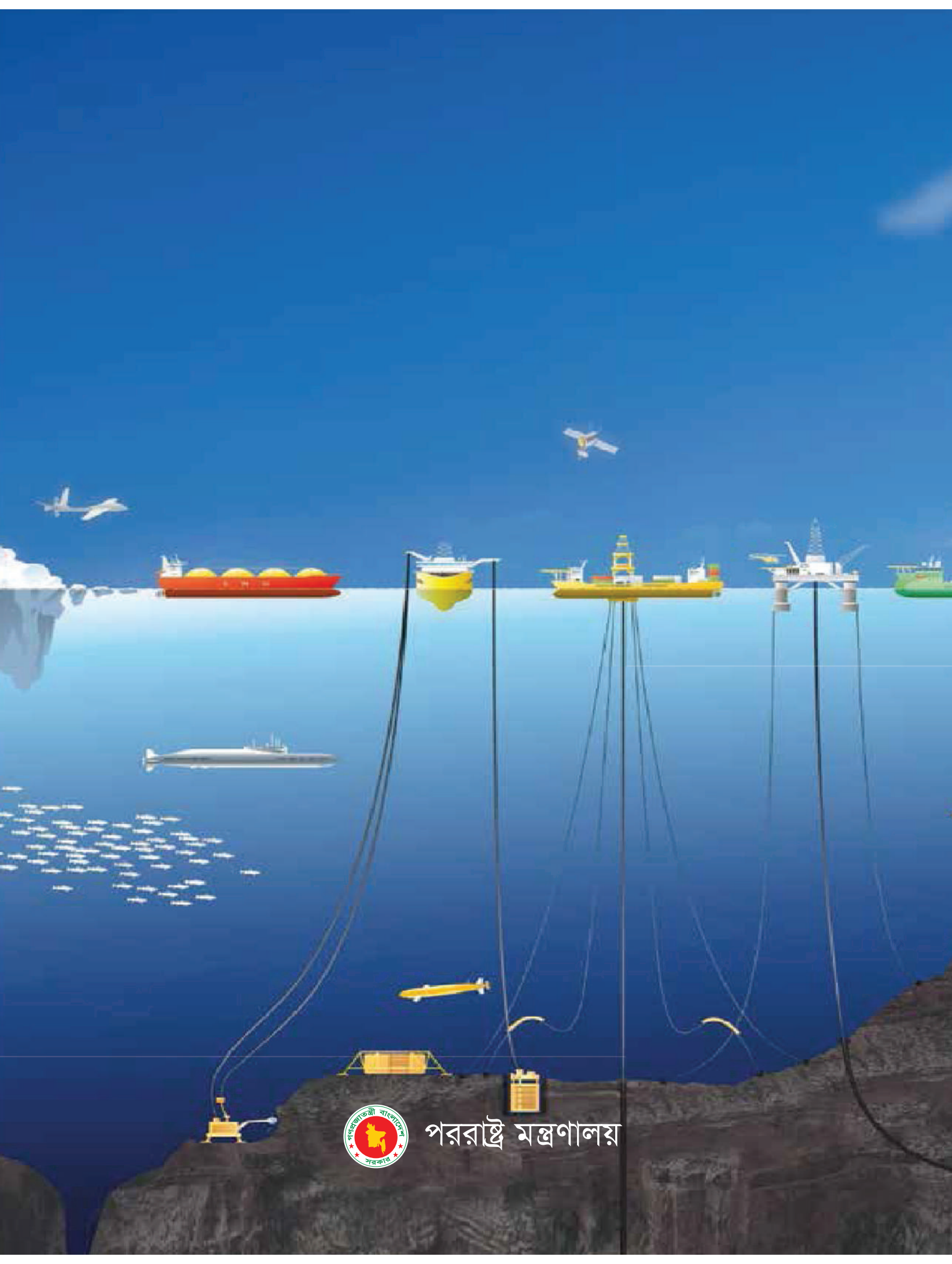

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়